শিক্ষক শিক্ষণ প্রবেশিকা

মূল্যঃ ২.০০

ভূমিকা

— লেখক এ দাবী করে না যে এই পুস্তকে শিক্ষা সম্বন্ধে, কোন দিক হইতেই, বিস্তারিত বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। বরঞ্চ সে স্বীকার করে যে এর অভাবই সর্বত্র লক্ষ্য করা যাইবে।

—এ পুস্তকের উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও পাঠ্যতালিকা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকদিগকে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া মাত্র। শিক্ষণাধীন হইবার পূর্বে বা শিক্ষণাধীন থাকাকালীন এই পুস্তক পাঠে শিক্ষকগণ জ্ঞাতব্য সব বিষয়ের একটা ধারণা করিতে পারিবেন। —কোন পুস্তকেই শিক্ষণাধীন শিক্ষকের জ্ঞাতব্য সব কিছু পাওয়া যাইবে না। অধ্যাপনা পুস্তকের অসম্পূর্ণতা পূর্ণ করে এবং শিক্ষার্থীর জ্ঞানের উপাদান হইবে—পুস্তক, অধ্যাপনা আর শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষায় লব্ধ অভিজ্ঞতা।

লেখকের স্বল্প আশা পূর্ণ হইলেই সে তাহার শ্রম সার্থক মনে করিবে।

লেখক এ পুস্তক রচনায় সাহায্যের জন্য তাহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছে।

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

॥ ১ ॥

ভারত-সরকার ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার জন্য, যত শীঘ্র সম্ভব, শিক্ষার ব্যবস্থার কথা ভাবিতেছিলেন। প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলের প্রাথমিক শিক্ষালাভের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। বকেয়া সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার যথাসাধ্য সম্প্রসারণ দ্বারাও মিটান সম্ভব নয়। তার জন্য সামাজিক (বয়স্ক) শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। অন্যদিকে, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের ফলে আশা করা হইতেছে যে বিদ্যালয়ে যাইবার বয়সের সীমার মধ্যে কোন বালক-বালিকা আর নিরক্ষর থাকিবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাধারণতঃ বয়স হইবে ছয় হইতে এগার বৎসর। আমাদের দেশের ঐ বয়সের সকল ছেলেমেয়ের জন্য বিদ্যালয়ের সংস্থান এক কঠিন সমস্যা। কিন্তু সমস্যা কালক্রমে সমাধান হইবে—এ ভরসায় আর বসিয়া থাকা যায় না।

[অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ সমস্যা-সমাধানকল্পে এক সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক উচ্চশিক্ষাভিলাষী ছাত্র-ছাত্রীকে একটী নির্দিষ্ট কালের জন্য শিক্ষকতা করিতে হইবে।]

শিক্ষা সম্প্রসারণের এই সমস্যার পাশাপাশি আর একটা জটিল সমস্যা আমাদের দেশে বর্তমান—তাহা শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সমস্যা, অথবা মধ্যবিত্তের বেকার-সমস্যা। ভারত-সরকার এক পরিকল্পনায় দুই সমস্যারই যুগপৎ সমাধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যবস্থা এই যে—প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারদিগকে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত করা হইবে। যেখানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে তাঁহারা অতিরিক্ত শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন, আর, যে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের অভাব সেখানে নূতন এক-শিক্ষকের-বিদ্যালয় (Single Teacher School) স্থাপন করা হইবে এবং নবনিযুক্ত শিক্ষকগণ সে সকল বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত হইবেন।

স্থির হইয়াছে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে (১৯৫১-৫৬) সারা ভারতবর্ষে আশি হাজার শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। তন্মধ্যে ১৯৫৩-৫৪—এ ত্রিশ হাজার এবং ১৯৫৪-৫৬ এর মধ্যে বাকী পঞ্চাশ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে।

[ভারতবর্ষে গণ-উন্নয়নের এক সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়া সুরু হইয়াছে। গ্রাম্য

সমাজে নেতৃস্থানীয় প্রত্যেক শিক্ষকের এ পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আবশ্যক। —এ বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পরে করা গেল।]

শিক্ষিত বেকারদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া একসংগে বেকার সমস্যা ও শিক্ষা সম্প্রসারণের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় সরকার যথেষ্ট কল্পনা ও গণ-প্রচেষ্টায় প্রত্যয় প্রদর্শন করিয়াছেন। শিক্ষকতা কার্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগের মধ্যে যথেষ্ট সাহসিকতা আছে। তাহাদিগকে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং সংগে সংগে তাহাদের উপর অশেষ বিশ্বাস স্থাপন করা হইয়াছে। নব নিযুক্ত শিক্ষকদিগকে এ বিশ্বাসের যোগ্য হইতে হইবে।

শিক্ষকগণকে এমন সব অঞ্চলে কাজ করিতে হইবে যেখানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বা শিক্ষিতের সংগ দুর্লভ। এ অসুবিধা লাঘবের জন্য এক জরুরী স্বল্পকালীন শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং যথোপযুক্ত পরিদর্শন ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনীয়তা সরকার স্বীকার করিয়াছেন। শিক্ষক-শিক্ষণোত্তীর্ণ শিক্ষক আত্মপ্রত্যয় লাভ করিবেন, বৃত্তিবিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করিবেন এবং সহানুভূতিপূর্ণ যোগ্য পরিদর্শকের নিকট হইতে নির্দেশাদি লাভ করিয়া বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন ও কাজে উৎসাহ লাভ করিবেন।

ভারত সরকারের নির্দেশ এই যে প্রস্তাবিত স্বল্পকালীন শিক্ষণের মেয়াদ হইবে ছয় সপ্তাহ। শিক্ষণ স্বল্পকালীন হইবে

বলিয়া পাঠ্য ও কার্যসূচী ইত্যাদি প্রণয়ন ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। দীর্ঘকালীন শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ্য বা কার্যসূচীর সংক্ষিপ্তসার নিরর্থক হইবে। তৎস্থলে শিক্ষকের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য মূল সূত্রগুলির (বিদ্যালয়-ব্যবস্থাপনা, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ও শিক্ষাদানপদ্ধতি এবং শিশু-শিক্ষার্থী সম্বন্ধে) আলোচনা দ্বারা ও হাতে-কলমে কাজ করাইয়া শিক্ষকদিগের মনে সঠিক মনোভাব (attitude) সৃষ্টি করিয়া দিতে হইবে। নীতিগত আলোচনার চেয়ে হাতে-কলমে কাজের উপর অধিক জোর-দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে।

শিক্ষাদানের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সঠিক মনোভাবের অভাবের জন্য শিক্ষার মান নৈরাশ্যজনক হইতে পারে। তাহা ছাড়া, পরিবেশের সংগে মানাইয়া স্বীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টায় শিক্ষকের বহু সময়, শ্রম ও উৎসাহের অপচয় হইতে পারে।

["The object of the present course is to give the teacher an initiation into the nature of his work, to arouse his interest, to make him appreciate some of the basic considerations which should guide him in his work as well as learn some of the essential matters of routine like the keeping of registers, preparation of reports etc. which he will have to undertake. Without such basic training, he is likely to be greatly handicapped in his work and suffer

'maladjustments' in the initial stages of his career."—পৃঃ ৩—Syllabus for Emergency Teacher Training under the Five Year Plan : Ministry of Education : Govt. of India.]

॥ ২ ॥

পশ্চিমবংগ সরকারও ভারত সরকারের পরিকল্পনাধীন নিজ পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। এ পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবংগে বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ('গ্র্যাজুয়েট', আই, এ বা আই, এস্, সি-পাশ ও 'ম্যাট্রিকুলেট্') দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। পুরাণ অথবা সদ্যস্থাপিত বিদ্যালয়সমূহে নবনিযুক্ত শিক্ষকেরা কাজে লাগিয়াছেন ও লাগিতেছেন।

এ পরিকল্পনা অনুসারে এক হাজার বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এইগুলি 'মিউনিসিপ্যাল'—এলাকায় স্থাপিত হইবে।

এ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতার উপর সরকার বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে।

বিভিন্ন জেলার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে কোন্ জিলায় কত নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন আর কয়টি বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইবে তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

॥ ৩ ॥

বর্তমান পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল প্রকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়ই কোন সর্বজনীন উন্নয়ন প্রচেষ্টার পূর্বেই এক পরিকল্পনা রচনাও গ্রহণ করা হয় এবং পরিকল্পনা অনুসারে জনসাধারণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুরু করে। পূর্ব-পরিকল্পনার সুবিধা এই যে ইহাতে অর্থ, শ্রম ও সময়ের মিতব্যয়িতা হয়। —ভারতবর্ষের সর্বাংগীন উন্নয়নের জন্যও এক পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হইয়াছে। উন্নয়ন কার্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হইবে। প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে বিশেষ বিশেষ বিভাগের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ধাপের উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য পাঁচ বৎসর করিয়া সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। প্রতিপাঁচ-বৎসর-কালের মধ্যে সমাপ্য প্রচেষ্টা সমূহের পরিকল্পনাকে এক একটী পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা বলা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৫১ হইতে ১৯৫৬। প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে উন্নয়ন-কার্য অগ্রসর হইয়াছে।

[ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে, ১৯৩৮-এ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে প্রথম জাতীয় পরিকল্পনা কমিটী—National Planning Committee—গঠিত হয়। অব্যবহিত পরে যুদ্ধ সুরু হওয়ায় এ "কমিটী" কিছু মূল্যবান তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহ ছাড়া কোন

উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে পারে নাই। পরে ১৯৪৪-এ 'বম্বে প্ল্যান্' প্রকাশিত হয়। এর পরে আরও কয়েকটী পরিকল্পনা রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী-পরিকল্পনা যে 'Planning Commission' দ্বারা রচিত তাহা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে ১৯৫০-এর মার্চ-এ কাজ সুরু করে। ১৯৫২-এর ৮ই ডিসেম্বর 'কমিশন্' ভারতীয় পার্লামেণ্ট'-এ পরিকল্পনা উপস্থাপিত করে।]

পরিকল্পনা—'কমিশন্' সিদ্ধান্ত করে যে ভারতের প্রধানতম সমস্যা দারিদ্র্য। দারিদ্র্য দূর করিয়া জনসাধারণের জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বাড়ান অত্যাবশ্যক। কিন্তু শিল্পোৎপাদন বাড়াইতে গেলে যে মূলধন ও কাঁচামাল অপরিহার্য তাহার সংগ্রহের জন্য কৃষির উন্নতি প্রথম আবশ্যক।—এ বিবেচনায় কৃষির উন্নতিকে সর্বাগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের পরিকল্পিত উন্নতিসাধন করা হইবে :—

(১) কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন

(২) জলসেচ ও শক্তি উৎপাদন

(৩) চলাচল ব্যবস্থা

(৪) শিল্প

(৫) সমাজ সেবা

(৬) পুনর্বাসন

(৭) বিবিধ

প্রত্যেক বিভাগেই 'কমিশন্' (ক) নীতি, (খ) কার্যক্রম রচনা করিয়াছে এবং (গ) নির্দিষ্ট নীতি অনুসারে কার্য দ্বারা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করিয়াছে। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন উদ্দেশ্যে সমাজ-উন্নয়ন ও গ্রাম-সেবা-সংস্থা মারফত কাজ সুরু হইয়াছে।

—["*Community Development* is the method, and *Rural Extension* the agency through which Five-Year-Plan seeks to initiate a process of transformation of Social and economic life of villages."]

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সরকারের নেতৃত্বে রচিত হইয়াছে: সরকার এ বিষয়ে বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছে: অভিজ্ঞের পরামর্শ ব্যবস্থা করিয়াছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়াছে। কিন্তু কাজের ভার জনসাধারণের উপর। সকলের অকুণ্ঠ সক্রিয় সহযোগিতায়ই এ পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইবে।

সুতরাং, সমাজের যোগ্য নেতাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। অথবা, নূতন নেতৃত্বের বিকাশসাধন করিতে হইবে।

সমাজের নেতারা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিবেন ও কাজে লাগাইবেন। গ্রাম্য সমাজে শিক্ষকের এ নেতৃত্বের দাবী অগ্রগণ্য। শিক্ষকগণকে গ্রামসেবক তথা নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে।

জাতিগঠন বা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে 'কমিশন্' সম্পূর্ণ সচেতন। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে কোটি কোটি অজ্ঞ ও মানসিক জড়তায় আচ্ছন্ন জনসাধারণের উন্নতি জনসাধারণের চেষ্টায়ই সম্ভব এবং সে চেষ্টায় তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আবশ্যক। বর্তমান্ শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বজনীন শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার চেয়েও বড় কথা প্রচলিত শিক্ষায় আমাদের জাতীয় প্রয়োজন মেটে না। তাই এ সত্য স্বীকৃত হইয়াছে যে আমাদের প্রয়োজন, শিক্ষার উদ্দেশ্য নূতন করিয়া নির্ধারণ করা, শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও বিভাগের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়-সাধন করা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে (বিশেষত বুনিয়াদী ও সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে) শিক্ষার সুযোগ বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত-করা, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার-সাধন করা, গ্রাম্য সমাজের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা-পরিকল্পনা করা, স্ত্রীশিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং অনগ্রসর অঞ্চল ও জাতিমূহের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার।

ভারতীয় সংবিধানে আছে যে রাষ্ট্রাধীন সকল নাগরিককে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিনামূল্যে, বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদান করা হইবে। সংবিধানের এ নির্দেশ প্রতিপালনের প্রথম ধাপে ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের সকল বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে।—সে অভীষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যেই নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষকদিগের নিয়োগ হইয়াছে।

শিক্ষণ-শিবিরের দৈনিক কার্যসূচী

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে স্বল্পকালীন শিক্ষণের মেয়াদ হইবে ছয় সপ্তাহ কাল মাত্র। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা বা পরিমাণ নেহাৎ অল্প নয়। তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী অত্যাবশ্যক। ভারত-সরকারের শিক্ষা-দপ্তর হইতে প্রকাশিত এই স্বল্পকালীন শিক্ষণ সম্পর্কিত পুস্তিকায় দৈনিক কার্যসূচীর এক নমুনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা অনুসারে এ কার্যসূচীর পরিবর্তন করা যাইতে পারে। প্রস্তাবিত কার্যসূচী নীচে দেওয়া গেল :—

[প্রতি সপ্তাহের সোমবার হইতে শুক্রবার পর্যন্ত]

সকাল ৫ টা হইতে ৬-৩০ প্রাতঃকৃত্যাদি
" ৬-৩০ " ৮ টা হাতের কাজ (কৃষি, বাগানের কাজ, সুতা-কাটা-ইত্যাদি)
" ৮-১৫ " ৮-৪৫ প্রাতরাশ
" ৮-৪৫ " ১১-৪৫ বক্তৃতা—(চারটী বক্তৃতা, প্রত্যেকটী ৪০ মিঃ এবং প্রত্যেক বক্তৃতার পর অবকাশ ৫ মিঃ)
দুপুর ১১-৪৫ " ১২-৩০ নিজ নিজ কাজের সময়
" ১২-৩০ " ১-৫০ মধ্যাহ্ন ভোজন
" ১-৫০ " ২-৫০ বিশ্রাম

অপরাহ্ন	৩ টা	,,	৩-৪০ বক্তৃতা
,,	৩-৪৫	,,	৪-২৫ লাইব্রেরীতে পর্যবেক্ষণাধীন পাঠ
,,	৪-৩০	,,	৫-৩০ আলোচনা সভা
,,	৫-৪৫	,,	৬ টা খেলাধূলা
সন্ধ্যা	৬ টা	,,	৭-১৫ নিজ নিজ কাজের সময়
,,	৭-১৫	,,	৮-১৫ নৈশ ভোজন
,,	৮-৩০	,,	৯-৩০ বৈঠক
রাত্র	১০টা		...............................সমাপ্তি...বিশ্রাম

ঋতুভেদে সময়ের তফাৎ হইবে।

শনিবার সামাজিক শিক্ষা ও গ্রামোন্নয়নমূলক কাজ হইবে।

রবিবার শিবিরের নিত্যকৃত্যাদি ছাড়া অন্যান্য সব কাজ বন্ধ থাকিবে।

উপরের কার্যসূচী হইতে বোঝা যাইতেছে যে প্রত্যেক শিক্ষককে শিক্ষণ-শিবিরে আবাসিক শিক্ষার্থী হিসাবে বাস করিতে হইবে।

শিক্ষণ-শিবিরে শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে এক সুস্থ সামাজিক জীবন গড়িয়া ওঠা বাঞ্ছনীয়। তদুদ্দেশ্যে শিবিরে অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকা আবশ্যক। খুব বেশী সংখ্যা বা খুব কম সংখ্যা বাঞ্ছিত সামাজিক জীবন গড়িয়া-ওঠার প্রতিকূল। এ কারণে কোন শিবিরে ১৫০ জনের অধিক শিক্ষার্থী না হওয়া ভাল।

শিবিরের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা গণতান্ত্রিক হওয়া কাম্য। আমাদের প্রত্যেকটী বিদ্যালয়ের পরিবেশ হইবে গণতান্ত্রিক। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র—যেখানে একজন আদেশ করে আর সকলে তা পালন করে—বিদ্যালয়ে অচল। এ উদ্দেশ্য সফল করিয়া তোলার জন্য শিক্ষক শুধু শিক্ষণবিষয়েই জ্ঞানলাভ করিবেন না—গণতান্ত্রিক জীবনযাপনেও তাহাকে অভ্যস্থ হইতে হইবে।

["If our schools are to function as little "democracies" and not as "Kingdoms" where one rules and the others obey, the teacher must not only be trained to teach, but also live democratically." পৃ—২৪ Syllabus for Emergency Teacher Training under the Five Year Plan : Ministry of Education : Govt. of India.]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণ যেমন সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার ও পালন করে, শিক্ষণ-শিবিরেও তেমনই বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব শিক্ষার্থীগণের লইতে ও পালন করিতে হইবে। শিবিরের প্রাত্যহিক কার্যাদি নির্বাহ করিতে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব গ্রহণ ও পালনের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। কাজের দায়িত্ব সমভাবে বণ্টন ও পালন ছাড়া বক্তৃতায় যে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া সৃষ্টি হয় তা মিথ্যা ও অস্থায়ী।

সান্ধ্যসম্মেলনগুলিতে প্রধানতঃ সারাদিনের কাজের আলোচনা হইবে। দিনের কাজের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় ব্যবস্থাপনার দিক্ দিয়া কোন পরিবর্তন আবশ্যক হইলে সে বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। আলোচ্য কোন বিশেষ সমস্যা না থাকিলে এবং আবশ্যিকভাবে মাঝে মাঝে সংস্কৃতিক বা সাধারণ আনন্দানুষ্ঠান ইত্যাদি হইতে পারে।

পূর্ববর্ণিত কার্যসূচী সমালোচনায় দেখা যাইবে যে শিক্ষার্থীদের নিজেদের পড়ার অবকাশ খুব কম, "Practice teaching" এর সুযোগ নাই এবং শিক্ষণ ব্যবস্থাটাই বক্তৃতার ভারে ভারাক্রান্ত। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের জ্ঞানদানের জন্য এ ত্রুটী মানিয়া না লইয়া উপায় নাই। অবশ্য, কয়েকটী বক্তৃতা বাদ দিয়াও যদি আদর্শ পাঠদানের নমুনা শিক্ষার্থীদের দেখান যায় এবং ঐ পাঠদান বিশ্লেষণ করিয়া শিক্ষার্থীদের পাঠন প্রণালী সম্বন্ধে বলা যায় তবে অধিক ফল আশা করা যাইতে পারে।—অধ্যাপকগণ যদি খুব সতর্ক হইয়া আলোচনা-সভাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা না করেন তবে পূর্বোক্ত ত্রুটী শোধরাইবার আর কোন উপায় নাই।

আলোচনা সভার জন্য শিক্ষার্থীগণকে ১৫।২০ জনের দলে দলে বিভক্ত করিয়া লইতে হইবে। শিক্ষার্থীগণকে উৎসাহিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারাই আলোচনা সুরু করে,

প্রত্যেকে আলোচনায় যোগ দেয় এবং এইভাবে নিজেদের লব্ধজ্ঞান বদ্ধমূল করিয়া লয় এবং তাহাদের সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজিয়া পায়। কোন অধ্যাপক যদি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা করার লোভে আলোচনা-সভাকে তাঁহার বক্তৃতা-সভা করিয়া লন তবে আলোচনা-সভার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইবে। এ বিষয়ে সতর্কতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয়সমূহের সহিত শিক্ষকগণের জ্ঞাতব্য বিষয় ও সমস্যাসমূহের অতি ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবে। আলোচনা ভাষা বা ভাবের দিক্ দিয়া শিক্ষকগণের সম্পূর্ণ বোধগম্য হইতে হইবে।

প্রত্যেক অধ্যাপক যদি তাঁহার বক্তৃতার বিষয়ের সারসংক্ষেপ এবং ঐ বিষয়ে কয়েকখানা পাঠ্য পুস্তকের নাম পূর্বাহ্নে "সাইক্লোষ্টাইল্" করিয়া শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে বিলি করেন তবে শিক্ষণাধীন কালে এবং পরে শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকার হইতে পারে এবং অধ্যাপকদেরও বক্তব্য সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত হইবে।

শিক্ষকের বাঞ্ছনীয় গুণাবলী

এককালে ধারণা ছিল যে উত্তম শিক্ষক হইবার যোগ্যতা সহজাত। যাহার সে সহজাত যোগ্যতা আছে তাহার পক্ষে কোন 'ট্রেনিং' অনাবশ্যক। আর যাহার সে যোগ্যতা নাই তাহার পক্ষে 'ট্রেনিং' নিরর্থক—'ট্রেনিং' দ্বারা কাহাকেও উত্তম শিক্ষক করিয়া তোলা যায় না।—সৌভাগ্যক্রমে এ ধারণা আজকাল কেহ পোষণ করেন না। উত্তম শিক্ষক হইবার জন্য কতগুলি ব্যক্তিগত গুণ আবশ্যক—এ কথা অনস্বীকার্য। তবে বর্তমানে এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত যে, অন্য যে কোন বৃত্তির মত শিক্ষকতার জন্যও প্রস্তুতি আবশ্যক এবং যথোপযুক্ত 'ট্রেনিং'—দ্বারা এ বৃত্তির যোগ্যতা অর্জন করা ও বাড়ান সম্ভব!

শিক্ষককে সর্বদা নিরলস মন হইতে হইবে। তিনি নিয়ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিবেন এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ সত্য গ্রহণ করিবেন। কখনই শিক্ষক মনে করিবেন না যে তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় জানা হইয়া গিয়াছে। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও স্বীয় অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি নিত্য জ্ঞান আহরণ করিবেন।

["A good teacher is constantly 'learning and unlearning', 'observing', and 'experimenting' and does not think that he has mastered his job and learned all there is to

learn once for all. We have to create this attitude of mind in all teachers."—পৃ ২—Syllabus for Emergency Teacher Trainning Under the Five Year Plan: Ministry of Education: Govt. of India.]

শিক্ষক নিজের চেষ্টায় সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণ না করিলে ক্রমশ অযোগ্য হইয়া পড়িবেন। কারণ, বিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা অনুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি ইত্যাদি বদলায়।

নিরলস মনের অধিকারী হওয়া ছাড়া, "সুশিক্ষক স্বভাবতই সৌম্য, সরল, অবিকলাংগ, কষ্টসহিষ্ণু এবং তীক্ষ্ণধী ও স্মৃতি-সম্পন্ন হইবেন। তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে কল্পনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পর্যবেক্ষণশক্তি, বিচার ও যুক্তি থাকা প্রয়োজন। তাঁহার মেজাজ সুস্থির ও স্বভাব ধীর হওয়া আবশ্যক। শিক্ষক শিশুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, স্নেহশীল, দয়াবান্, প্রফুল্লচিত্ত, সরল ও ভদ্র হইবেন। মৌলিকতা শিক্ষকের একটী প্রকৃষ্ট গুণ। ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়চিত্ততা ও সৎস্বভাব শিক্ষকতার ভিত্তিস্বরূপ। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের কৌশল, ভাষাশক্তি, শিক্ষাপ্রণালীর চমৎকারিত্ব, রসজ্ঞান, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমাধুর্য এবং আত্মপ্রত্যয় সফলতার পরম সহায়ক। গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা অত্যন্ত দূষণীয়। অবস্থা আয়ত্তীকরণ ক্ষমতা একটী অতি প্রয়োজনীয় গুণ"।

* পৃঃ ৯৭—শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান: শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য

প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যাবলী

শিক্ষণাধীন শিক্ষকগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অথবা উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হইবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বয়স ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত হইবে। সুতরাং শিক্ষকদিগের শিক্ষাধীনকালে পাঠ্য বিষয় সমূহ, ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকার শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাহাদের প্রয়োজনের সহিত পূর্ণ সংগতি রক্ষা করিয়া স্থির করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য মোটামুটি নিম্নলিখিত চারটী ঃ

(১) পরিচ্ছন্নতা—(ব্যক্তিগত ও সামুদয়িক) বোধ সৃষ্টি ঃ
(২) মৌখিক ও অন্যান্য অভিব্যক্তি দ্বারা আত্মপ্রকাশের শিক্ষা ঃ
(৩) লেখাপড়া ও অন্যান্য জাগতিক বিষয়ে জ্ঞানদান ঃ
(৪) ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশ ঃ

("Broadly speaking, primary education may be interpreted to centre round the following four objectives :—

I. Cleanliness—personal and Community.
II. Training in self-expression—oral and manual.
III. Literacy and general knowledge.

IV. Individual and social develoment."—পৃ ৪
Syllabus for Emergency Teacher Training under the Five Year Plan.)

(১) **পরিচ্ছন্নতাবোধ সৃষ্টি**: বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য সমাজের অবহেলিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষার বিস্তারসাধন এবং সেই শিক্ষা এমন হইবে যে তাহা শিক্ষার্থীদের জীবনকে স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে ও উদ্যমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। সাধারণ যে সমস্ত গ্রাম বা সহরের প্রান্ত অঞ্চলে নূতন সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে সেখানে এখনও পর্যন্ত শিক্ষা ও সভ্যতার আলো ঠিকমত পৌঁছায় নাই। এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে পরিচ্ছন্নতা বোধ নাই—তাহাদের ঘর-বাড়ী, জামা-কাপড় এবং সমস্ত পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন। আমাদের সারা দেশেই পরিচ্ছন্নতার অভাব এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের নানা রোগ ও বহু অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার অভাব। পরিচ্ছন্নতাবোধ সৃষ্টি না হইলে, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে অভ্যস্ত না হইলে, শুধু চিকিৎসার সুযোগ বিস্তার দ্বারা অকালমৃত্যু ঠেকান যাইবে না। সমাজের সর্বসাধারণ পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবহিত ব্যক্তিগণও বিভিন্ন রোগ এড়াইতে পারিবেন না: ট্রেন-এর কামরা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি কোন সাধারণ স্থান স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা যাইবে না।

সুফলই বহন করে না। তাই ব্যক্তিগত ও সামাজিক—এই উভয়বিধ বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য।

গণতন্ত্রের প্রথম কথাই হইতেছে ব্যক্তি ও সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান। সাধারণত ব্যক্তির আশা আকাংখার সহিত সমষ্টির কল্যাণ পরস্পর বিরোধী সম্পর্কযুক্ত হয়। নানা আর্থিক গণ্ডীতে এবং নানা বর্ণ ও ধর্মভেদে বিভক্ত জনসাধারণের মধ্যে সমষ্টিকল্যাণচেতনা জাগ্রত করা কঠিন।

ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজকল্যাণ চিন্তার সমন্বয়সাধনের শিক্ষা মাত্র উপদেশবর্ষণে দেওয়া যায় না। আচরণ, চিন্তা ও ভাব সকল দিকেই এ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকগণ শিক্ষণকালে শিক্ষাশিবিরে এই সামাজিক শিক্ষা আচরণগত-ভাবে লাভ করিবেন ও পড়াশুনা এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া উহাকে বুদ্ধি ও ভাবগতভাবে গ্রহণ করিবেন। তবেই তাঁহারা নিজ নিজ বিদ্যালয়ের শিশুগণের মধ্যে এই শিক্ষা বাস্তবভাবে দিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহাদেরই চেষ্টায় বৃহত্তর সমাজে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাহারা তাহাদের বিদ্যালয়কে এক একটী সমাজ-কল্যাণধর্মী ক্ষুদ্র সমাজরূপে গড়িয়া তুলিবেন এবং শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সমাজের উপযোগী আচরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে। এই সমাজ বৃহত্তর সমাজের মধ্যেও শুভ পরিবর্তনের প্রেরণা জাগাইবে।

শিক্ষণীয় বিষয়াবলী

শিক্ষানীতি

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্ণিত চারিটি উদ্দেশ্যের সংগে সংগতি রক্ষা করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষাণাধীন শিক্ষককে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানদানের জন্য ভারত-সরকার পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করিয়াছে। শিক্ষার আধুনিক ধারা ও গ্রামাঞ্চলের জন্য বাঞ্ছিত শিক্ষার আদর্শের সংগেও সংগতি রক্ষা করা হইয়াছে।

[শিক্ষকের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচনা আঠারটি বক্তৃতায় শেষ করার নির্দেশ আছে।]

শিক্ষানীতি-আলোচনা দ্বারা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে শিক্ষার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। শিক্ষকতায় সাফল্য লাভের জন্য এ আলোচনা অপরিহার্য কিনা—এ প্রশ্ন আজ আর কারো মনে নাই। প্রাত্যহিক কার্য-সম্পাদনে সজ্ঞানভাবে শিক্ষক এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারেন, কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য বা আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কখনই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না।

শিক্ষানীতির অন্তর্গত জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ সম্বন্ধে নীচে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা করা গেল।

শিক্ষার অর্থ ঃ শিক্ষার অর্থ মানবশিশুর দেহ ও মনের শক্তিসমূহের বিকাশসাধন। জৈব স্তরের আদিম মানুষের শিক্ষা জীবনধারণের কৌশল আয়ত্ত করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। মানুষের মননের বিকাশের সংগে সংগে মানুষ তার প্রত্যক্ষ পরিবেশ ও জীবনধারণের প্রয়োজন ছাড়াইয়া ভাবিতে ও শিখিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই মানুষের শিক্ষার অর্থ হইতে সৎ ও স্বাধীন জীবিকার্জনের যোগ্যতা বাদ যায় নাই। যে শিক্ষায় মানুষের শুধু মননশক্তি বাড়ে, সৎ ও স্বাধীন জীবিকার্জনের শক্তি লাভ হয় না, তাহা নিরর্থক।

সভ্য মানুষের পরিবেশ ও আদর্শ নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং এ পরিবর্তন ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। মানুষ শিক্ষা দ্বারা মনের গতিশীলতা লাভ করে—পরিবর্তিত পরিবেশে নিজকে মানাইয়া চলিতে শেখে। ব্যক্তি বা সমাজ এ গতিশীলতা গুণেই ক্রমশ উন্নতি ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। এ গুণের অভাবে বহু জীবশ্রেণী ও মনুষ্য সমাজ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ প্রত্যেক মানুষের জীবনের দুই দিক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক। সুস্থ সামাজিক জীবনযাপনের জন্য মানুষের জীবনের এ দুই দিকেরই সুসমঞ্জস বিকাশ আবশ্যক। নির্গুন ও অক্ষম ব্যক্তি সমাজের ভার মাত্র। অপরপক্ষে, অসামাজিক বিদ্বান্ ব্যক্তি অবাঞ্ছিত।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের প্রয়োজন ও আদর্শ অনুসারে আত্মবিকাশসাধনই ব্যক্তির শিক্ষার উদ্দেশ্য। জনহীনদ্বীপের রবিন্‌সন ক্রুশোর শিক্ষা (?) শিক্ষানীতির আলোচ্য নয়।

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থাধীন শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিকাশকে লক্ষ্য করিয়াই শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ নির্বাচিত হইয়াছে।

গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের শিক্ষা : শিক্ষা এক বিশেষ অর্থে ভবিষ্যত জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং বর্তমান পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক জীবনই আদর্শ সামাজিক জীবন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মানবশিশু তাহার শিক্ষা মারফত এ গণতান্ত্রিক জীবন যাপনে প্রস্তুত ও অভ্যস্থ হইবে।

গণতন্ত্রের মূলনীতি, ব্যক্তিস্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের সামঞ্জস্য-বিধান, ব্যক্তির ইচ্ছা বহুর ইচ্ছার অধীন করা,—সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা-করা, সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির নিজেকে নিরলস-ভাবে নিয়োগ করা।

পুঁথির মারফত বা বক্তৃতাদ্বারা এ শিক্ষা দেওয়া যায় না। অভ্যাসের দ্বারা এ শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হয়।

এ শিক্ষাদানের জন্য, প্রথমত, শিক্ষক জাতি-ধর্ম, বিদ্যা-বুদ্ধি নির্বিশেষে সমদর্শী হইবেন। পাঠদান প্রণালী, বিদ্যালয়-শাসনব্যবস্থা, খেলাধূলা ও উৎসব অনুষ্ঠানাদি এমনভাবে

পরিকল্পনা ও পরিচালনা করিবেন যাহাতে শিক্ষার্থীরা সকলে সমান অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সমান সুযোগ-সুবিধা পায় এবং পুরস্কার-তিরস্কারের সমান অংশভাগী হয়।

ছাত্রদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি প্রতিষ্ঠানগতভাবে আনুগত্য জাগাইতে হইবে। তাহারা যেন বিদ্যালয়ের গৌরবে আনন্দিত ও অগৌরবে দুঃখিত বোধ করে এবং বিদ্যালয়ের গৌরব ও সুনাম বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাহাদের দায়িত্ব বলিয়া বোধ করে।

কিতাবী জ্ঞান লাভই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় ও অগ্রগতির মাননির্ণয়ের জন্য বুদ্ধি, স্মৃতি, মেধা প্রভৃতি পরিমাপক পরীক্ষা প্রচলিত থাকে তবে শিক্ষার্থীদের মনে গণতন্ত্রের আদর্শ বদ্ধমূল করা কঠিন হয়। প্রত্যেক ছাত্রের প্রবৃত্তি ও প্রতিভা আবিষ্কারের জন্য বই পড়ার সংগে সংগে নানা হাতের কাজ ও অনুষ্ঠানাদি প্রবর্তন আবশ্যক।

মোট কথা, বিদ্যালয় পরিচালনা এমন হইবে যেন শিক্ষার্থীর মনে "লেখাপড়া করে যেই গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সেই" এ রকম কোন ভ্রান্ত আদর্শ না জন্মে। সে যেন সমস্ত জীবনের জন্য "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" এ আদর্শ শেখে।

সমাজে বিদ্যালয়ের স্থান: শিক্ষার অর্থ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও উপায় প্রভৃতি সমাজের সমকালীন অবস্থা ও আদর্শ দ্বারা স্থিরীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে সমাজের যোগ্য নাগরিক করিয়া তোলা। সুতরাং, শিক্ষক সমাজের আজ্ঞাবহ সেবকমাত্র এবং বিদ্যালয় সমাজেরই অন্তর্গত, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিষ্ঠান মাত্র।

উপরিউক্ত নীতি সত্য হইলেও ইহাকে একান্তভাবে স্বীকার করিয়া লইলে শিক্ষা ও শিক্ষককে ছোট করা হয়। সমাজের উপর শিক্ষা, শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের প্রভাব অস্বীকৃত হয়। সমাজ ভাবী বংশধরদের ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষক শুধু সমকালীন আশা-আকাংখা বা আদর্শের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া সমাজের চিরস্থায়ী প্রয়োজন ও মংগলের আদর্শ সাম্‌নে রাখিয়াই (সমকালীন আদর্শকে অস্বীকার না করিয়া) শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তার ফলে, সাময়িক আদর্শ তার যোগ্য সম্মান পাইলেও, শাশ্বত আদর্শই বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হয়—বিশেষ যুগের দোষ-ত্রুটি স্থায়ী হয় না—সমাজ ক্রমশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। শিক্ষা ও সমাজ পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে।

বৃহত্তর সমাজের স্বাধীন পরিবেশে শিশুকে ভবিষ্যতের আদর্শ জীবনের জন্য শিক্ষিত ও উপযুক্ত করিয়া তোলা সহজ বা সম্ভব নয়। তাই সমাজের মধ্যেই বিদ্যালয়ে শিশুর শিক্ষা তথা ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির জন্য এক বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এ ভাবে দেখিলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ কৃত্রিম ও সংকীর্ণ।

কিন্তু কার্যত বিদ্যালয়ের পরিবেশকে বৃহত্তর সমাজের বাস্তব পরিবেশের অনুরূপ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। অন্যথায়, শিক্ষায় কৃত্রিমতা আসিবে, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবনের প্রস্তুতির প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হইবে।

বিদ্যালয়ে সমাজান্তর্গত এক ক্ষুদ্র সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেখানকার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান উদ্দেশ্যমূলক হইবে—প্রত্যেক অনুষ্ঠান দ্বারাই শিক্ষার্থী কোন না কোন বাঞ্ছিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করিবে অথবা প্রয়োজনীয় কোন ক্রিয়ার অভ্যস্ত হইবে।

তবে, এ বিষয়ে শিক্ষককে অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হইবে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট ও প্রধান হইয়া উঠিলে অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীর উৎসাহ ও আনন্দ থাকিবে না, উহা তাহার উপর পীড়ন হইয়া উঠিবে। শিক্ষা প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও আনন্দ না থাকিলে সমস্ত প্রক্রিয়া ব্যর্থ হইবে।

স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশ, ক্রিয়া, দলগত ক্রিয়াঃ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর স্বাধীনতাকে স্বীকার করিয়া নেওয়া সাম্প্রতিক। এককালে শিশুকে পাত্রমাত্র মনে করা হইত।—বয়োজ্যেষ্ঠেরা তাহাদের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের নির্দিষ্ট পরিমান জ্ঞানদানকেই শিশুর শিক্ষা মনে করিতেন। শিশুর স্বাধীন সত্বা, প্রবৃত্তি, শক্তি, অনুরাগ-বিরাগ বিবেচনা করা হইত না। সৌভাগ্যক্রমে মানবশিশুর সে দুর্ভাগ্য শেষ হইয়াছে। আজকার শিশুশিক্ষার গোড়ার

কথাই শিশুর স্বাধীনতা। শিশু তাহার দেহ-মনের বিকাশ, অনুরাগ-বিরাগ অনুসারে স্বাধীন আনন্দে শিক্ষা লাভ করে। শিশুর স্বাধীনতা স্বীকৃতির সংগে সংগে শিক্ষণীয় বিষয়ের গুনগত ও পরিমানগত পরিবর্তন ও পাঠদান পদ্ধতির নানা সংস্কার সাধিত হইয়াছে।

আত্মপ্রকাশের ক্ষমতালাভ শিক্ষার অন্যতম বা প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সকলের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম এক হইতে পারে না। তাই আজ শিশুর পাঠ্যসূচী সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। নৃত্য-গীত-অংকন প্রভৃতি শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং, আজকার সর্বজনাধিগম্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলেই যার যার স্বকীয়ত্ব অনুসারে আত্মপ্রকাশের মাধ্যম খুঁজিয়া পাইবে এবং স্বীয় প্রতিভা অনুসারে আত্মবিকাশের সুযোগ পাইবে। আত্মপ্রকাশের পথ সংকীর্ণ রাখিলে প্রতিভার অপচয় ও সমাজের ক্ষতি হয়।

পূর্বকালে জ্ঞানলাভ প্রচেষ্টায় শিশুর কোন সক্রিয় অংশ ছিল না—সে থাকিত নির্বাক শ্রোতা বা দ্রষ্টা। প্রধানত, শিক্ষকের বক্তৃতা শুনিয়া বা 'বোর্ড'-এর লেখা দেখিয়া সে সে শিক্ষা (?) লাভ করিত। "Talk and Chalk" মারফত শিশুকে শেখান যায় না, একথা আধুনিক শিশুশিক্ষাবিদেরা বহু পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিতভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিশু স্বভাবত চঞ্চল—খেলাধূলা উপলক্ষে সে নানা ক্রিয়ানুষ্ঠান করে। পারিবারিক পরিবেশ ও অবস্থা অনুসারে

শিক্ষা বিষয়ক মনোবিজ্ঞান

[শিক্ষা বিষয়ক মনোবিজ্ঞান দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়। এ বিষয়ের আলোচনা কুড়িটি বক্তৃতায় শেষ করার নির্দেশ আছে।]

মনোবিজ্ঞান : মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যাইবে যে এ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু প্রথমে ছিল আত্মা, তারপর মন এবং তারপর চেতনা। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বহির্ব্যবহার (behaviour)।

মানুষে মানুষে আকৃতি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, সম্ভাবনা প্রভৃতিতে বহু তফাৎ। দেশ ও কালভেদেও মানুষে মানুষে কত তফাৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু বিশেষ পর্যবেক্ষণে দেশকালপাত্র নির্বিশেষে মানুষের মনের ধর্মগত একটা ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এ তথ্যই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বস্তুতান্ত্রিক (objective) এবং ইহার প্রণালী অনুসন্ধানমূলক (experimental)। ব্যবহার-তান্ত্রিক মনোবিজ্ঞান মনের কাজ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে, নানারকম পরীক্ষা দ্বারা নানা তথ্য নিরূপণ করে। ইহা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ও ব্যক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণীও করে বা করিতে পারে।

শিক্ষা বিষয়ক মনোবিজ্ঞান : পরীক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকারভেদে মনোবিজ্ঞানের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। শিক্ষা

বিষয়ক মনোবিজ্ঞান ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের এক বিশেষ শাখা। মনোবিজ্ঞান-আবিস্কৃত বিভিন্ন নীতি ও সূত্র ইহা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। তাই, সাধারণত শিশু ইহার লক্ষনীয় বস্তু এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ইহার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র।

শিশুর অনর্জিত, জন্মলব্ধ শক্তি ও প্রবৃত্তি, পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত বৃত্তি, শক্তি, গুণাগুণ, বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ, শিশুর দেহ-মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর ও তদনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়, তাহার পরিমাণ ও শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ এবং শিশু-শাসন প্রণালী ইত্যাদি শিক্ষা বিষয়ক মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

শিক্ষক ও মনোবিজ্ঞানঃ শিক্ষার লেন-দেন ব্যাপারের তিনদিক্,—শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষণীয় বিষয়। বিভিন্ন সমাজ বিভিন্নকালে এই তিনদিকের কোন-না-কোনটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত শিক্ষার্থী প্রধান বিবেচনা ছিল না—শিক্ষক ও শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপিত হইত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু প্রথম ও প্রধান বিবেচনা। আধুনিক শিক্ষা শিশুকেন্দ্রিক। শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি নির্ধারণ-কালে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি, শক্তি, বুদ্ধি-ই প্রধান বিবেচ্য। তাই শিশু মনের সমস্ত তথ্য শিক্ষকের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

শিশুর মনের খবর জানা ও বোঝার জন্য মনোবিজ্ঞান

শিক্ষকের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। তারপর, শিক্ষক শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অবশ্য যথেষ্ট জ্ঞানবান্ হইবেন। তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিবেন ও সেই জ্ঞান কার্যত ব্যবহার করিবেন। অন্যথায় শক্তি ও সময়ের অপচয় অবশ্যম্ভাবী। সর্বশেষে শিক্ষক নিজেকে শিশুর পরিবেশের অংশ মনে করিয়া শিশুর শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবেন।

"মনোবিজ্ঞানের সহিত পরিচয়ে শিক্ষক প্রথমত শিক্ষার্থী সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর এবং বিকাশ-অনুকূল পরিবেশ ও পঠিতব্য বা করণীয় বিষয় সম্বন্ধে, তৃতীয়ত শিক্ষাদান ও গ্রহণ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও তথ্যাদি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আহরণ দ্বারা আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সহিত নিজ কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন।"*

অনর্জিত ব্যবহার ঃ পূর্বের আলোচনায় শিশুর অনর্জিত, জন্মলব্ধ শক্তি ও প্রবৃত্তি, পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শক্তি ও গুণাগুণ এবং পরিবেশ ইত্যাদি কয়েকটী কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। এগুলি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে সেগুলি ক্রমান্বয়ে নিম্নে আলোচিত হইল।

জন্মকালেই শিশুর কয়েকটী অনর্জিত ব্যবহারের পুঁজি থাকে। এগুলি সে করিতে পারে বলিয়াই সে বাঁচিয়া থাকে। এ ব্যবহারগুলির প্রধান খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস

* পৃঃ ১০৩—শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান (শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য)

ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, মলমূত্রত্যাগ। এ সকল ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পেশী ও গ্রন্থিসমূহ জন্মকালেই কার্যক্ষম থাকে।

শিশু জন্মকালেই কতগুলি স্বক্রিয় ব্যবহার (automatic action) ও কতগুলি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার (Reflex-action) শক্তি লইয়া জন্মায়। যে সকল প্রতিক্রিয়া অনর্জিত, ব্যক্তির আয়ত্তের বাইরে এবং কোন বাহিরের উদ্দীপনার উপর নির্ভর করেনা সে-সকলকে স্বক্রিয় ব্যবহার বলা হয়, যেমন পাকস্থলীর সংকোচন-প্রসারণ, বিভিন্ন অংগের কাঁপন, চোখের পাতার নাচন ইত্যাদি। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার জন্য বাহিরের উদ্দীপনার দরকার। জন্মিবার পূর্বেই শিশু-দেহে কতগুলি স্নায়ুসন্ধি সম্পূর্ণ হয় এবং বিশেষ উদ্দীপনার উপস্থিতিতে সেগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে। যেমন, চোখের কাছে কিছু আসিলে চোখ আপনা হইতেই বুজিয়া যায়, তাপ লাগিলে অংগ সংকুচিত হয়। জীবন রক্ষায় প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

সহজাত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া হইতে জটিল। কতগুলি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া লইয়া গঠিত, অনর্জিত, পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত ব্যবহারকে সহজাত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি বলা চলে।

সহজাত প্রবৃত্তিতে অর্জিত বা অনুকৃত অংশ আবিষ্কার করা যায়, সহজাতবৃত্তির সংখ্যা লইয়া ব্যবহারতন্ত্রী মনোবৈজ্ঞানিকদের মতের যথেষ্ট অমিল ইত্যাদি কারণে কেহ কেহ সহজাত বৃত্তি স্বীকার করিতে চান না।

শিক্ষকের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়। তারপর, শিক্ষক শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অবশ্য যথেষ্ট জ্ঞানবান্ হইবেন। তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করিবেন ও সেই জ্ঞান কার্যত ব্যবহার করিবেন। অন্যথায় শক্তি ও সময়ের অপচয় অবশ্যম্ভাবী। সর্বশেষে শিক্ষক নিজেকে শিশুর পরিবেশের অংশ মনে করিয়া শিশুর শিক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবেন।

"মনোবিজ্ঞানের সহিত পরিচয়ে শিক্ষক প্রথমত শিক্ষার্থী সম্বন্ধে, দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর এবং বিকাশ-অনুকূল পরিবেশ ও পঠিতব্য বা করণীয় বিষয় সম্বন্ধে, তৃতীয়ত শিক্ষাদান ও গ্রহণ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও তথ্যাদি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আহরণ দ্বারা আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়তার সহিত নিজ কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন।"*

অনর্জিত ব্যবহার : পূর্বের আলোচনায় শিশুর অনর্জিত, জন্মলব্ধ শক্তি ও প্রবৃত্তি, পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত শক্তি ও গুণাগুণ এবং পরিবেশ ইত্যাদি কয়েকটী কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। এগুলি সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা আবশ্যক। অতি সংক্ষেপে সেগুলি ক্রমান্বয়ে নিম্নে আলোচিত হইল।

জন্মকালেই শিশুর কয়েকটী অনর্জিত ব্যবহারের পুঁজি থাকে। এগুলি সে করিতে পারে বলিয়াই সে বাঁচিয়া থাকে। এ ব্যবহারগুলির প্রধান খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক, শ্বাস-প্রশ্বাস

* পৃঃ ১০৩—শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান (শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য)

ক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, মলমূত্রত্যাগ। এ সকল ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পেশী ও গ্রন্থিসমূহ জন্মকালেই কার্যক্ষম থাকে।

শিশু জন্মকালেই কতগুলি স্বক্রিয় ব্যবহার (automatic action) ও কতগুলি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার (Reflex-action) শক্তি লইয়া জন্মায়। যে সকল প্রতিক্রিয়া অনর্জিত, ব্যক্তির আয়ত্তের বাইরে এবং কোন বাহিরের উদ্দীপনার উপর নির্ভর করেনা সে-সকলকে স্বক্রিয় ব্যবহার বলা হয়, যেমন পাকস্থলীর সংকোচন-প্রসারণ, বিভিন্ন অংগের কাঁপন, চোখের পাতার নাচন ইত্যাদি। প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার জন্য বাহিরের উদ্দীপনার দরকার। জন্মিবার পূর্বেই শিশু-দেহে কতগুলি স্নায়ুসন্ধি সম্পূর্ণ হয় এবং বিশেষ উদ্দীপনার উপস্থিতিতে সেগুলি সক্রিয় হইয়া উঠে। যেমন, চোখের কাছে কিছু আসিলে চোখ আপনা হইতেই বুজিয়া যায়, তাপ লাগিলে অংগ সংকুচিত হয়। জীবন রক্ষায় প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

সহজাত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া হইতে জটিল। কতগুলি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া লইয়া গঠিত, অনর্জিত, পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত ব্যবহারকে সহজাত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি বলা চলে।

সহজাত প্রবৃত্তিতে অর্জিত বা অনুকৃত অংশ আবিষ্কার করা যায়, সহজাতবৃত্তির সংখ্যা লইয়া ব্যবহারতন্ত্রী মনোবৈজ্ঞানিকদের মতের যথেষ্ট অমিল ইত্যাদি কারণে কেহ কেহ সহজাত বৃত্তি স্বীকার করিতে চান না।

প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির সাড়া জাগাইতে নির্দিষ্ট উদ্দীপনা প্রয়োজন হয়। এ যেন এক একটি নির্দিষ্ট চাবি দিয়া এক একটি তালা-খোলা। আহার্যের দর্শনে বা ঘ্রাণে বুভুক্ষা প্রবৃত্তি জাগরিত হয়।

ম্যাক্‌ডুগাল-এর মতে প্রধান সহজাতবৃত্তি চৌদ্দটি, অপত্যস্নেহ, যোধন প্রবৃত্তি, কৌতূহল, বুভুক্ষা, ঘৃণা, আত্মরক্ষা বা পলায়ন, যৌথ প্রবৃত্তি, আত্মন্মন্যতা, আত্মাবমাননা, যৌন প্রবৃত্তি, অর্জন প্রবৃত্তি, সৃজনী প্রবৃত্তি, আর্তবৃত্তি ও হাসি।

বিভিন্ন সহজাতবৃত্তি জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিকাশ লাভ করে। এগুলির বিকাশের ধারা জানিতে পারিলে শিশুর মনের ক্রমবিকাশের ধারাও জানা ও বোঝা যায়। এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন না করিতে পারিলে শিশুর জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বা শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করা যায় না। অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তি দমন ও বাঞ্ছিত প্রবৃত্তির বিকাশসাধনের জন্যও শিশুর বিভিন্ন বৃত্তির ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে জ্ঞান দরকার।

মনে রাখিতে হইবে যে শাসন-পীড়ন দ্বারা কোন সহজ প্রবৃত্তির বিনাশসাধন সম্ভব নয়। সহজ চরিতার্থতার পথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে অবদমিত প্রবৃত্তি দেহ ও মনে বিকার সৃষ্টি করে।

"শিক্ষা বা পরিবর্তন-সাধন কার্যে শিক্ষককে শিশুর সহজাত বৃত্তি, ভাব ও আবেগের সাহায্যে ও আনুকূল্যেই

অগ্রসর হইতে হয়। প্রকৃতির প্রতিকূলে চলিলে সফলতার আশা নাই বললেই চলে। জীবনপ্রেরণার ও সংস্কারের অনুকূল স্রোতে শিক্ষাতরণী ভাসাইতে পারিলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছান সহজ। ইহাতে সময় ও শক্তির অপচয় খুব কম হয়। তবে জীবন প্রেরণা ও সংস্কারের সু ও কু, বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত, শিব ও অশিব, সত্য ও অসত্য, সুন্দর ও অসুন্দর উভয় দিকই আছে। সুএর-সমর্থন, উৎসাহদান, বিবর্ধন ও দৃঢ়ীকরণ এবং কু-এর অসমর্থন, দমন, উন্নয়ন ও বিশুদ্ধীকরণ ইহাই বাঞ্ছনীয়।"*

বংশানুক্রমঃ পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত যে-সকল সংস্কার ও গুণাগুণ লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে তাহা তাহার বংশানুক্রম। ইহা অংশত জাতীয় বংশানুক্রমও (racial heredity) বটে।

বংশানুক্রমের রীতি অনুসারে একজাতীয় প্রাণী সেই জাতীয় প্রাণীরই জন্ম দেয়। একজাতীয় জীবের জন্ম দিলেও, জনক-জননী ও সন্তান সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই জনক-জননী ও সন্তানের মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পিতামাতার অর্জিত কোন পরিবর্তন সন্তান উত্তরাধিকারসূত্রে পায় না। সম্ভাব্যতাই মাত্র পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়।

বংশানুক্রমের ভিত্তির উপর শিক্ষা গড়িয়া তুলিতে হয়। তাই শিক্ষার্থীর বংশানুক্রম শিক্ষকের জ্ঞাতব্য। শিশুর

---

* পৃঃ ১৬৪—শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান (শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য)

সহজাত শক্তি ও বংশানুক্রম শিশু কী ভাবে কতটুকু গড়িয়া উঠিবে তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দেয়।

পরিবেশ : শিশু সহজাত শক্তি ও বংশানুক্রমের মধ্যে সুপ্ত যে সম্ভাবনা লইয়া জন্মে তাহার পূর্ণ বিকাশ ও চরিতার্থতার জন্য পরিবেশ অনুকূল হওয়া আবশ্যক। শিশুর আচরণের উপর প্রভাবশীল, তাহার বহিঃস্থ ব্যক্তি, বস্তু ও অবস্থাসমূহ দ্বারা শিশুর পরিবেশ গঠিত হয়। প্রভাব বা পরিবেশ শিশুর আভ্যন্তরিন শক্তি ও সম্ভাবনার সম্পূরক। প্রভাব শিশুর প্রকৃতি বদলাইতে পারে না। অনুকূল প্রভাব বা পরিবেশ শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকশিত করে মাত্র। "প্রকৃতি উপাদান, প্রভাব সুযোগ।"

শিক্ষা-ব্যবস্থা মানুষের তৈরী কৃত্রিম পরিবেশ। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাব সীমাবদ্ধ। তবুও শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রকৃতি জানিবেন—তাহার সুপ্ত শক্তির সম্যক বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যালয়ে সৃষ্টি করিবেন। বিদ্যালয়ের পরিবেশের প্রতিকূলতায় যেন কাহারো স্বকীয়ত্ব বিকাশের বিঘ্ন না হয়।

ব্যক্তিগত পার্থক্য (Individual Differences) : একটি শিশুর মধ্যে জন্মের অব্যবহিত পর হইতেই অপর শিশু হইতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্যের ক্ষেত্র বহু ও বিচিত্র—দেহে, মনে, আচরণে, বুদ্ধিতে ও ব্যক্তিত্বে দুই শিশুর মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। দুই শিশু বিভিন্ন বয়সে বসিতে,

হাঁটিতে শেখে একরকম অতি সচরাচর দেখা যায়। প্রত্যাবর্তক আচরণ বা বুদ্ধিতে তফাৎ অবশ্য বিশেষ পর্যবেক্ষণে ধরা যায়। বিভিন্ন শিশুর দেহ ও মনের বাড়তি সমতালে হয় না বলিয়া আচরণ পৃথক হয়।

ব্যক্তিগত পার্থক্যের কতগুলির জন্য শিশুর বংশানুক্রম, কতগুলির জন্য তার পরিবেশ এবং কতগুলির জন্য অসুস্থতা বা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা দায়ী। যে কোন বিশেষ পার্থক্যের কারণ নির্ণয়ের জন্য শিশুকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা দরকার। চেষ্টা দ্বারা এ পার্থক্য সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না, যেহেতু শিশুর উপর ক্রিয়াশীল প্রভাবের সংশোধন বা পরিবর্তন সম্ভব হইলেও শিশুর প্রকৃতিতে নিহিত কারণ প্রায় অপরিবর্তনীয়।

পিতামাতা বা শিক্ষক ব্যক্তিগত পার্থক্য স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিয়া নিবেন। ইহাতে খুব ভয়ের কোন কারণ আছে বলিয়া মনে-করাও যুক্তিযুক্ত নয়। কোন শিশু একদিকে অনগ্রসর হইলেই সব দিকে অনগ্রসর হইবে এ ধারণা সত্য নয় এবং দেহ ও মনের বাড়তির তাল সমান নাও হইতে পারে।

শিক্ষক ব্যক্তিগত পার্থক্য বা বিশেষত্ব স্বীকার করিবেন—নিয়মাকানুনের কড়াকড়িতে তাহা দমন করিতে চেষ্টা করিবেন না। তিনি বিদ্যালয়ের পরিবেশে ব্যক্তি স্বকীয়ত্ব স্বীকার করিয়া প্রত্যেক শিশুকে শিখাইবেন ও আত্মবিকাশের সুযোগ দিবেন। অনগ্রসরতা ও অতি-অগ্রসরতা সমান স্বাভাবিক।

শিশু কী করিয়া শেখেঃ শিশু তাহার চারদিকের বিশাল পৃথিবীকে চেনে তাহার পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—মাধ্যমে। শিশুর শিক্ষায় এই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রথম জিজ্ঞাসা 'এটা কী? ওটা কী?' এ জিজ্ঞাসার মৌখিক জবাবে উদ্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় না। কোন বস্তুর আকৃতি, রূপ, গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ, ওজন, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংগে সংগে মন অনুভূত বস্তু সম্বন্ধে সক্রিয় হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে অর্থ আরোপিত হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হয়। যেমন, ত্বকের উদ্দীপনার ফলে স্পর্শ অনুভূতির পর স্পর্শলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তির উপরই উচ্চস্তরের জ্ঞান ও চিন্তা সম্ভব। শিশুর শিক্ষায় এ বিষয় কোন ক্রটী থাকিলে তাহার মানসিক বিকাশ ক্রটীপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হয়। সুতরাং, পিতামাতা ও শিক্ষক ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের অবাধ সুযোগ শিশুকে দিবেন। শিশু বইতে যাহা পড়ে বা শিক্ষকের বক্তৃতায় যাহা শোনে তাহা সম্বন্ধে তাহার কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকিলে শিক্ষায় শিশু আনন্দ পায় না এবং শিক্ষা বিফল হয়।

এ কারণে আধুনিক শিশুশিক্ষায় শিশুকে, তাহার পরিবেশ-পরিচিতির জন্য, বিভিন্ন বস্তু ধরিয়া-ছুঁইয়া, ভাঙিয়া-গড়িয়া,

পরীক্ষা ও যাচাই করিয়া ও কাজে ব্যবহার করিয়া দেখিবার সুযোগ ব্যবস্থা করিয়াছে। একই উদ্দেশ্যে—শিক্ষায় কাজ, ভ্রমণ ইত্যাদির যথার্থ গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শিশু যত বড় হইয়া উঠে পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতূহল তাহার তত বাড়ে। তাহার চারপাশের সবাইকে সে নানা প্রশ্নে অস্থির করিয়া তোলে। শিশুকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইতে নিরস্ত না করিয়া তাহার প্রশ্নের যতদূর সম্ভব সদুত্তর দেওয়া উচিত। তার প্রশ্নের উত্তরে কোন জটিল তত্বের অবতারণা না করিয়া তাহার বোধগম্য উত্তর দেওয়াই বিধেয়।

শিশু প্রত্যক্ষ জ্ঞান স্মৃতির সাহায্যে মনে সঞ্চয় করিয়া রাখে। অচেনা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য সে নূতন ক্ষেত্রে তাহার পূর্বজ্ঞান ব্যবহার করে—অচেনাকে চেনার সংগে তুলনা করিয়া তাহাদের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য অনুভব করে ও নূতন জ্ঞান লাভ করে। এভাবে সে কল্পনা, বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যে পরিবেশ-পরিচয় সম্পূর্ণ করিয়া তোলে। শিশুর শিক্ষায় কল্পনা, বুদ্ধি, যুক্তির চর্চা ও বিকাশের সুযোগ আবশ্যক। আধুনিক শিশুশিক্ষায় কাল্পনিক রূপকথা ও বিভিন্নপ্রকার সৃজনাত্মক কল্পনার যথেষ্ট গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং শিশুকে কিছু করা বা বলার আগে বিচার করিতে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাহাতে শিশুর বুদ্ধি ও যুক্তি পরিপক্ক হয়।

শিক্ষার্জনবিধি ঃ প্রথমতঃ শিক্ষককে মনে রাখিতে

হইবে যে যেই প্রভাব ও পরিবেশে শিশু আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করে সে প্রভাব ও পরিবেশে শিক্ষা সফল ও সন্তোষজনক হয়। অপর পক্ষে, যে প্রভাব বা পরিবেশে শিশু পীড়িত বোধ করে সে প্রভাব ও পরিবেশে শিশুর শিক্ষা বিফল হয়। তাই শিশুর শিক্ষা প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক করিয়া তুলিতে হয়। কোন দুঃখ, অপমান বা পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতা যেন শিক্ষার সংগে সংযুক্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

এ নীতির অনুসরণেই বিদ্যালয়ের ও শ্রেণীর পরিবেশ সুন্দর ও সুখকর হওয়া উচিত। পাঠ্যবস্তু শিশুর বোধগম্য হওয়া উচিত ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠদানকালে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আচরণ মনোরম হওয়া উচিত। লক্ষ্য করিতে হইবে যে শিশু শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়, বিষয়ের প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ না জন্মে।

প্রশংসা ও উৎসাহ শিশুকে অনুরাগী করে এবং নিন্দা ও দমন শিশুকে বিদ্বেষী করে। শিক্ষক প্রশংসা-নিন্দা ও পুরস্কারে-তিরস্কারের অতি সতর্ক ব্যবহার করিবেন।

দ্বিতীয়ত, এ নীতি স্মরণীয় যে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে জ্ঞান, বিদ্যা ও নিপুণতা সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়। অপর পক্ষে, অনুশীলন ও চর্চার অভাবে লব্ধ জ্ঞান, বিদ্যা ও নিপুণতা হ্রাস পায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিধি একসংগে কাজ করে। সুখকর অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বা পুনঃ স্মরণে আনন্দ আছে। তাই আমরা সে অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি বা পুনঃ স্মরণ করি।

তৃতীয়ত, শিশুর উন্মুখতা-বিমুখতা, অনুরাগ-বিরাগ, সামর্থ্য-অসামর্থ্য, প্রস্তুতি-অপ্রস্তুতি শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষক সর্বদা বিবেচনা করিবেন। স্নায়ুকোষগুলি কর্মের জন্য উন্মুখ ও প্রস্তুত থাকিলে শিশু তখন কাজে আনন্দ পায়। অপর পক্ষে বিমুখ ও অপ্রস্তুত শিশুকে দিয়া কাজ করাইতে গেলেই সে পীড়িত হয়। তাই শিক্ষাদান কার্যে শিশুর স্বাস্থ্য, অবসাদ, শিক্ষণীয় বিষয়ের উপযোগীতা ইত্যাদি বিশেষ বিবেচ্য এবং প্রত্যেক কাজের সূচনায় শিশুমনকে সেই কাজে উন্মুখ করিয়া নিতে হয়।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা ঃ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানানুমোদিত। শিশু বা কিশোর তার পরিবেশের সংগে কাজের মাধ্যমে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে ভালবাসে। তাহার পক্ষে চুপ-করিয়া-বসিয়া বই পড়িয়া শেখা প্রায় স্বভাব বিরুদ্ধ। তাহার প্রাণশক্তি তাহাকে কর্মচঞ্চল করে—খেলিতে, গড়িতে, ভাঙিতে সে ভালবাসে। স্বভাব বিরুদ্ধ কোন প্রচেষ্টায় তাহাকে শেখান অপেক্ষা তাহার স্বভাব ও শিক্ষার সংগে সংযোগ স্থাপন করিতে পারিলে শিক্ষকের কাজ সহজ হয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের কষ্টের লাঘব ও লব্ধ জ্ঞান সুদৃঢ় হয়। আধুনিক শিশু-শিক্ষায় শিশুর ক্রিয়াশীলতা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত। আমাদের দেশে প্রচলিত বুনিয়াদী শিক্ষায় কোন হাতের কাজের সংগে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সহ-সম্পর্ক (Co-relation) স্থাপন করিয়া

শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে আশাজনক সুফল পাওয়া গিয়াছে।

শিক্ষার সংগে উদ্দেশ্য সংযোগঃ সাধারণ অর্থে শিক্ষা সর্বদাই উদ্দেশ্যমূলক। শিক্ষার সংগে সাধারণভাবে উদ্দেশ্যের যে সংযোগ তাহা ছাড়া শিক্ষা সম্পৃক্ত সকল ক্রিয়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিশুকে পূর্বেই অবহিত করিয়া তাহাকে ক্রিয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত করাইলে শিক্ষাদান ও গ্রহণ প্রচেষ্টায় অধিক সুফল পাওয়া যায়। ইহাতে শিশু অধিকতর উৎসাহের সংগে নিজেকে কাজে নিযুক্ত করে এবং পূর্ব হইতে উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট থাকায় শ্রম বা প্রয়াসের অপচয় হয় না।

উদ্দেশ্যের সংগে শিশুর কোন সহজাত বা অর্জিত প্রবৃত্তির অথবা কোন আদর্শের অথবা সামাজিক প্রশংসার আকাংখা বা নিন্দার ভয়ের যোগ না থাকিলে শিশুকে ক্রিয়াবিশেষে উৎসাহী করিয়া তোলা যাইবেনা এবং উদ্দেশ্যারোপ বিফল হওয়ার আশংকা থাকিবে।

অভ্যাসঃ কোন বিশেষ কার্য পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের ফলে সে কার্যানুষ্ঠানে যে প্রবণতা ও দক্ষতা সৃষ্টি হয় তাহাই সেই কার্যের অভ্যাস। অভ্যাস সুগঠিত হইলে অভ্যস্ত কার্যসম্পাদনে দৈহিক বা মানসিক আয়াস প্রয়োজন হয় না—অনায়াসে সে কার্য করা যায়। অভ্যাস যেমন দক্ষতা দেয় তেমন প্রেরণাও দেয়।

কোন অভ্যাস গঠন ও সংরক্ষণের জন্য অনুকূল পরিবেশ

প্রয়োজন। কতগুলি সদভ্যাস মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অত্যাবশ্যক। শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত সদভ্যাসগুলি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা এবং বিদ্যালয়ে সে অভ্যাসগুলির গঠন ও সংরক্ষণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

অভ্যাস গঠনে পুনরাবৃত্তি আবশ্যক। কিন্তু শিশুকে দিয়া জোর করিয়া কোন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করাইলে শিশু সে কার্যে অভ্যস্ত হইবে না বরং তাহার মনে সে কাজের প্রতি বিরাগ জাগিবে। জোর করিয়া গঠিত অভ্যাস স্থায়ী হয় না। শিশুকে কোন বিষয়ে অভ্যস্ত করিতে হইলে তাহাকে সে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া সে বিষয়ের প্রতি তাহাকে অনুরাগী করিয়া তুলিতে হইবে; সে যেন সে কাজ করার একটা তাগিদ আপনা হইতেই বোধ করে। তাহা হইলে সে অভ্যাস সুদৃঢ় ও স্থায়ী হইবে।

কোন কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে শিশুকে উহা কেন অবাঞ্ছনীয় ও ক্ষতিকর তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং উহা পরিত্যাগে তাহার মনে ইচ্ছা জাগাইতে হইবে।

যে অভ্যাসের উদ্দেশ্য কোন বিষয়ে দক্ষতা বা নিপুণতা লাভ সে অভ্যাস গঠনের ক্রমিক স্তর আছে। সরল ও অনায়াস অভ্যাস হইতে সুরু করিয়া ক্রমশঃ জটিল, আয়াসসাধ্য ও নিপুণ অভ্যাসের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। নিম্নস্তরের অভ্যাসের সাহায্যে উচ্চস্তরের অভ্যাগ গঠিত হয়।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের বিকাশের স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন অভ্যাসগঠনে তাহাকে উৎসাহী করিবেন। সরল অভ্যাস হইতে সুরু করিয়া, উহার সহায়তায় ক্রমশ জটিল ও মিশ্র অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করিবেন।

চরিত্র ঃ অনেকের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র-গঠন। শিক্ষকের জানা দরকার চরিত্র বলিতে কি বোঝায় এবং ব্যক্তির মধ্যে বাঞ্ছনীয় চরিত্রের বিকাশ কিভাবে সম্ভব। কোন ব্যক্তির সহজাত বৃত্তি, ভাব, আবেগ ও আদর্শের সুসংহত রূপ তাহার চরিত্র।

পরিবেশই চরিত্রগঠনের একমাত্র কারণ নয়। একই পরিবেশে বিভিন্ন চরিত্র সম্ভব এবং দেখা যায়। ব্যক্তির সহজাত বৃত্তি, শক্তি ও ভাব চরিত্রগত বৈষম্যের কারণ। দৈহিক স্বাস্থ্যও চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে। স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তি চেষ্টা ও চর্চায় বাঞ্ছিত চরিত্র গঠন করিতে পারে।

আত্মসম্মানবোধ চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়ক।

সহজাত প্রবৃত্তি সমূহের উন্নয়ন, স্থায়ী ভাবাবেগ ও আদর্শের সংগঠন এবং ইহাদের সংযোগ চরিত্রগঠনের স্তর ও উপায়। পুনঃপুনঃ আচরণ ও ব্যবহার দ্বারা কোন ভাবকে সুদৃঢ় করিলে তাহা চরিত্রের অংশ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সহজাত বৃত্তিসমূহ সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে কুফলজনক হইতে পারে। কোন সহজাত প্রবৃত্তি ও কোন নীতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে আদর্শ অবাঞ্ছনীয়

প্রবৃত্তিকে দমন করে—ব্যক্তিকে অবাঞ্ছনীয় আচরণ হইতে নিবৃত্ত করে।

পিতামাতা, শিক্ষক বা আত্মীয়স্বজন শিশুর সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন ও নিজেদের আচরণ ও উদাহরণ দ্বারা শিশুর চরিত্রগঠনে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। নিকট ব্যক্তির অনুকরণ শিশুর স্বভাব।

ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ চরিত্র সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা বা কার্য—এ তিন শক্তিরই বিকাশ আবশ্যক। আমরা রোজই এমন ব্যক্তি দেখিতে পাই যাহার জ্ঞান আছে কিন্তু সে জ্ঞান তাহার ভাব বা কার্য নিয়ন্ত্রিত করে না, অথবা জ্ঞান ও ভাব দুই-ই আছে কিন্তু সেই জ্ঞান ও ভাব অনুসারে কার্যানুষ্ঠান সে করে না। এমন ক্ষেত্রে ইচ্ছা বা কার্যের অভাবে জ্ঞান ও ভাব নিরর্থক। "ইচ্ছাশক্তির জ্ঞান, ভাব ও কর্ম এই ত্রি-ধারার সুষ্ঠু, মংগলময় ও সুমঞ্জস বিকাশ ও প্রয়োগ দ্বারাই চরিত্র সংগঠিত হয়।"

শিশুর ইচ্ছা শক্তির বিকাশের সংগে সংগে তাহার অনুশীলন দরকার। যে ক্ষেত্রে সম্ভব শিশুকে তার কাজের ফলাফল ভাবিতে শেখান উচিত, কোন ইচ্ছা জাগা মাত্রই তাহা পূরণ না করিয়া সুস্থির মনে ফলাফল চিন্তার অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তি দমন ও আত্মসংযমের শিক্ষা হয়। সংযম আর ইচ্ছাশক্তির বাঞ্ছিত নিয়ন্ত্রণ প্রায় সমার্থবোধক।

শিশুর কাজ করার ও আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা কখনও দমন

না করিয়া পঠন-পাঠনে এমন পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে যাহাতে শিশুর ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি প্রবর্তন দ্বারা শিশুকে ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিজ দায়িত্বে কাজ করার শক্তি অর্জন করিতে দিতে হইবে।

শিশুর অপরাধ, কারণ, প্রতিকার ঃ অপরাধ-বিচারে ষোল বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের শিশু (অপরিণত বয়স্ক অর্থে) ধরা হয়। শিশুর সব কিছু দুষ্টুমিই অপরাধ নয়। শিশুর সাধারণ দুষ্টুমি খেলা পর্যায়ে পড়ে এবং তাহার জীবনে এর প্রয়োজনীয়তাও আছে। শিশুর সমাজ-বিরোধী কাজকে (চুরি, ডাকাতি, সাংঘাতিক আঘাত, যৌন অপরাধ ইত্যাদি) অপরাধ বলা হয়।

শিশুর সহজাত বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক প্রকাশ ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইলে শিশুর দেহ ও মনে যে বিকার সৃষ্টি হয় তারই ফলে শিশু অপরাধপ্রবন হইয়া উঠে। তবে কোন বিশেষ অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে উহার কারণ মাত্র একটি নয়—বহু কারণ মিলিয়া ঐ অপরাধ ঘটাইয়াছে। বংশানুক্রম, সহজাতবৃত্তি প্রভৃতি অপরাধের প্রেরণা জোগায় এবং পরিবেশ সেই প্রেরণাকে কার্যে রূপান্তরিত করে।

শিশু ব্যক্তিগতভাবে দৈহিকপুষ্টির অভাব, বিকলাংগতা, মানসিক শক্তিহীনতা ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি কারণে অপরাধ প্রবন হয়। পারিপার্শ্বিক কারণের মধ্যে গৃহের পরিবেশ ও সংগীদের প্রভাব শিশুকে অপরাধী করিয়া তোলে।

প্রত্যেকটি অপরাধের কারণ সঠিক নির্ণয় করিতে পারিলেই তাহার প্রতিকার সম্ভব। কারণ অনুসারে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ নির্ণয় ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, শিশু চরিত্রের জ্ঞান, ধৈর্য ও সহানুভূতি আবশ্যক। কোন অপরাধের কারণ যদি পরিবেশ হয় তবে কৌশলে অপরাধী শিশুর নিকট হইতে তাহা জানিতে হইবে। শাস্তির ভয় দেখাইয়া বা শাস্তি দিয়া শিশুর নিকট হইতে আবশ্যক তথ্য পাওয়া যাইবে না। শিশুকে ভয় না-দেখাইয়া, কোন শাস্তি দেওয়া হইবে না, তাহার গোপন কথা কাহাকেও বলা হইবে না—এরূপ আশ্বাস দিয়া শিক্ষক, পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন শিশুর নিকট হইতে সব খবর জানিতে পারেন। কারণ জানিয়া, প্রয়োজনবোধে পরিবেশ পরিবর্তন করা যাইতে পারে।

শিশু-অপরাধ প্রতিকারে একথা স্মরণীয় যে অপরাধ অপেক্ষা অপরাধীর গুরুত্ব অনেক বেশী এবং শাস্তির চেয়ে অপরাধের প্রতিকার বহুগুণ বেশী কাম্য।

শিশু অপরাধ নিবারণে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমধিক। প্রত্যেক শিশুর দেহ ও মনের পরীক্ষাও যেক্ষেত্রে প্রয়োজন সকল প্রকার অস্বাভাবিকত্বের চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং বাসস্থান, আমোদপ্রমোদ, জীবনমানের উন্নয়ন, জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সুব্যবস্থা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

পিছিয়ে-পড়া শিশু (a backward child) : অপরাধ-প্রবণ শিশুরই মত পিছিয়ে-পড়া শিশুও পিতামাতা ও শিক্ষকের

সমস্যা হইয়া পড়ে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সে আর দশজনের সংগে সমান গতিতে চলিতে পারে না। কিছুদিন বাদে পিতামাতা ও শিক্ষক তাহাকে অকেজো ভাবিয়া অনাদর করে—তাহার মনেও এ ধারণা জন্মে যে সে আর সকলের চেয়ে হীন এবং ফলে সকল দিক দিয়াই তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বাবা-মা এরকম শিশুকে দীর্ঘকাল আত্মনির্ভরতা না শিখাইয়া খোকা-খুকুর মত লালনপালন করে। এরকম আচরণে শিশুর সম্ভাবনা আরও কমিয়া যায়।

শিশুর পিছিয়ে পড়ার কারণ যদি দৈহিক অস্বাস্থ্য বা দুর্বলতা হয়, তবে স্বাস্থ্যপরীক্ষাও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মানসিক দুর্বলতা যদি অনগ্রসরতার কারণ হয় তাহা হইলে তাহার শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক।

শিশুর মানসিক বৃদ্ধির প্রতি পিতামাতা লক্ষ্য রাখিবেন। যদি শিশু আর দশজন স্বাভাবিক শিশুর সংগে সমান তালে অগ্রসর হইতে না পারে তবে তাহার সম্বন্ধে কোন অযথা উচ্চাশা পোষণ না করিয়া তাহার মানসিক ক্ষমতায় যে বৃত্তির পক্ষে সে উপযুক্ত হইবে সেরূপ কোন বৃত্তির জন্য তাহাকে উপযোগী করিয়া তোলার শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য যথেষ্ট মানসিক শক্তি আবশ্যক হইলেও, প্রত্যেক সমাজেই যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি দেখা যায় যাহারা মানসিক শক্তিতে একটু হীন হইয়াও সুখী ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করিতেছে।

পাঠদান প্রণালী

শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের অন্যতম উপায় তাহার শিক্ষাদান প্রণালী। উত্তম পাঠদান প্রণালী শুধু কোন বিষয় শিক্ষার্থীর নিকট সরল ও সরস করে বা শিক্ষার্থীর মনে তাহা সহজে বদ্ধমূল করে, তাহাই নয়। পাঠদান কৌশলে অভ্যস্ত শিক্ষকের সংগে শিক্ষার্থীর একটা সহজ, সুস্থ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং তাহার পক্ষে শ্রেণীর শৃংখলা রক্ষা অতি সহজ হয়।

শিশু শ্রেণীতে পাঠদান কালে নিম্নলিখিত কতগুলি মৌলিক নীতি কখনই ভুলিলে চলিবে না।

সব সুস্থ শিশুই সক্রিয়ঃ সুস্থ শিশু সাধারণত নানা ছেলে-খেলার মধ্য দিয়া নিজেকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার মধ্যে তাহাকে শিক্ষা দানের নানা সুযোগ পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ে একটা অস্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি না করিয়া, শিশুর স্বাভাবিক নানা কাজের মধ্য দিয়াই শিশুকে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় শিখাইতে হইবে।

শিশু কাজ করিতে করিতে নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে। দশজন মিলিয়া কাজ করিতে করিতে বা খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক অভিজ্ঞতা হয়।

বাগানের কাজ, পুতুল-খেলা, ছবি আঁকা, রান্না করা ইত্যাদি কাজ হইতে শিশু বস্তুসাপেক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে।

কিন্তু, এযাবতকাল বিদ্যালয়ে শিশু প্রধানত লাভ করিত পুস্তকলব্ধ অভিজ্ঞতা। পুস্তকে বর্ণিত অভিজ্ঞতা শিশুর নিজের করিয়া লওয়ার পক্ষে বিঘ্ন এই যে পুস্তকে বর্ণিত জগত শিশুর অপরিচিত। তাই শিশুকে পুস্তকের ভাষা পর্যন্ত মুখস্থ করিতে হয়। আধুনিক শিশু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রারম্ভিক স্তরে পুস্তকের ভার লাঘব করা হইয়াছে। শিশু অভিজ্ঞতা লাভ করিবে—নানা প্রয়োজনীয় বিষয় শিখিবে, কাজের মাধ্যমে।

শিশু নীরব শ্রোতা নয়—কর্মী ঃ প্রায়ই দেখা যায় যে শিক্ষক অনর্গল কথা বলিয়া যান আর শিশুরা নির্বাক শ্রোতা। এ নীতি সর্বথা পরিহার্য। কাজের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা লাভ করিবে। কাজ করিতে করিতে যখন সে কোন সমস্যার সম্মুখীন হইবে ও সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহান্বিত হইবে তখন শিক্ষক তাহাকে সে বিষয়ে শিক্ষা দান করিবেন। শিক্ষক এরূপ সুযোগের অপেক্ষায় থাকিবেন। প্রয়োজনবোধে শিশুকে সমস্যার সম্মুখীন করিয়া তাহার জানিবার ইচ্ছা জাগরিত করিতে হইবে।

শিশু তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়া জ্ঞান লাভ করে—শুধু কান দিয়া নয়। বক্তৃতায় বিশ্বাসী শিক্ষক এ কথা ভুলিয়া যান।

শিশু নিজেই নিজের শিক্ষক ঃ “কাজের মাধ্যমে

যেখানে শিক্ষার ব্যবস্থা, সেখানে শিশুকে কাজ করতে দিতে হবে, শিক্ষক থাকবেন তার পশ্চাতে—অলক্ষ্যে। আদর্শ কর্ম-কেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের স্থান পরোক্ষ, শিশুই প্রত্যক্ষ। শিশু কাজ করবে আপন মনে ; যখন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই কেবল সে শিক্ষকের সাহায্যের জন্য তাঁকে ডাকবে বা তাঁর কাছে আসবে। শিক্ষকের পক্ষে সেইজন্য একই সময়ে হাতের কাজ পরিচালন করা এবং লিখন-পঠনে সহায়তা করা সম্ভব। শিশু নিজে নিজেই শিক্ষালাভ করবে। শিক্ষক তাকে সহায়তা করবে মাত্র।" *

একটি কাজ উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা : শিশু শিক্ষার্থীর নিকট তাহার পাঠ্যসূচী অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের (যেমন বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) পৃথক কোন সত্তা নাই। তাই শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠ্য-বিষয়-সমূহ পৃথক পৃথক করিয়া শিখাইবার কোন অর্থ নাই। শিশুর বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে উপযোগী একটি কাজ উপলক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন বিষয় কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে নীচে তাহা আলোচনা করা গেল।

কাজ : বাগান-করা।

প্রস্তুতি : প্রথম মৌখিক আলোচনা দ্বারা স্থির করিতে হইবে বাগানটি কীভাবে তৈয়ার করিতে হইবে ; কোথায়

* শিক্ষণ-ব্যবহারিকা (পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার-১৯৫০) পৃ ১৩

কোন গাছ বসাইতে হইবে, কোন্ গাছে কী সার দিতে হইবে এবং গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য কী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কর্মপদ্ধতি ঃ ছাত্রেরা বাগানের জায়গা মাপিবে, আগাছা পরিস্কার করিয়া মাটি প্রস্তুত করিবে, প্রয়োজনমত সার দিবে এবং গাছগুলি সারি করিয়া বসাইবে। দুই সারির মধ্যে ও চারার মধ্যে সমান দূরত্ব রাখিতে হইবে। একটা নির্দিষ্টসংখ্যক চারার যত্নের ভার একটি ছাত্র লইবে।

কী কী বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে ঃ (১) কোন কাজ করার আগে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এ কাজের মাধ্যমে শিশুরা সে শিক্ষা লাভ করিবে। সমস্যার উদ্ভব হইলে তাহা সমাধানে তাহারা সচেষ্ট হইবে।

(২) মাতৃভাষা ঃ প্রস্তুতির সময় মৌখিক আলোচনায় ছাত্রেরা মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশের সুযোগ পাইবে। কাজের হিসাব রাখিতে কিছু না কিছু লিখিতে হইবে। যে ঋতুতে কাজ হইবে সে ঋতুর শোভা সম্বন্ধে শিশুদের পড়িয়া শোনান যাইতে পারে এবং তাহারা সে সম্বন্ধে নিজেরাও লিখিতে বা পড়িতে পারে।

(৩) অংক ঃ বাগানের জায়গা মাপিতে ছাত্রেরা মাপিতে শিখিবে এবং তাহাদের গজ, হাত ইত্যাদি দৈর্ঘ্যের ধারণা জন্মিবে। গাছ মাপিতে তাহারা 'স্কেল'-এর ব্যবহার শিখিবে। উৎপন্ন ফসল ওজন করা, তাহার মূল্য নিরূপণ বিষয়েও তাহারা ব্যবহারিক অংকের সংগে পরিচয় লাভ করিবে।

(৪) ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি: বিভিন্ন লোকের বাগান শিশুরা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিবে। চাষীরা তাহাদের খেতের উৎপন্ন দ্রব্যাদি কোথায় বিক্রয় করে, কোথায় হাট বসে, হাটে অন্যান্য কী সব জিনিষ বিক্রয় হয়, শিশুরা সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে। এই উপায়ে বিভিন্ন বস্তু ও সেগুলির উৎপত্তিস্থানে সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন মানুষও তাহাদের জীবিকা সম্বন্ধে শিশুর যে জ্ঞান জন্মিবে তাহাই শিশুর ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞানের ভিত্তি হইবে।

(৫) প্রকৃতি পরিচয়, বিজ্ঞান, শরীর চর্চা ইত্যাদি: বাগানের কাজে শিশুর প্রকৃতির সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে। প্রকৃতির সংগে এই পরিচয় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম সোপান হইবে।

বাগানের কাজে শিশুদের অংগচালনার যথেষ্ট সুযোগ মেলে এবং খোলা বাতাসে এরকম অংগচালনায় শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতি আশা করা যায়।

এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পাঠ্য সমস্ত বিষয়ই পর্যায়ক্রমে কোন একটি কাজকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া যাইবে এরূপ ধারণা করিলে ভুল হইবে।*

---

* "শিক্ষণ-ব্যবহারিকা" পৃ ৮-৯

॥ ভাষা শিক্ষা ॥

বিদ্যালয়ে শিশুকে ভাষা শিক্ষাদানের কী প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, কী কাজের মাধ্যমে ভাষা শিখাইতে হইবে, কী কী সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে ইত্যাদি নির্ধারণের ভার শিক্ষকের। শিশুর ভাষা শিক্ষাদানের ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি নির্দেশ দেওয়া যায় মাত্র।

প্রারম্ভিক স্তরে শিশুকে ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য তাহার আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সহজ ও সরল ভাষায় শিশু নিজের পরিচিত বস্তু বা নিজের কোন অভিজ্ঞতার কথা বলিবে। স্তোত্রপাঠে, জাতীয় সংগীত বা অন্যান্য সংগীত গাইতে, ছড়া বা গল্প বলিতে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে। শিশুর সমস্ত কাজ, তাহার বাস্তব পরিবেশ ও কল্পনা, তাহার আগ্রহ ও অনুরাগ—সমস্ত কিছু বিষয় শিক্ষক শিশুকে বলিতে, পড়িতে ও লিখিতে শিখাইবেন।

আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীতে ছবি ও ছড়ার বই ছাড়া কোন পাঠ্যপুস্তক নাই। যে শিশু ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, সে অন্যের ভাব, অন্যের ভাষায় ভাল করিয়া বুঝিবে এ আশা দুরাশা। তাই শিশু ছড়া বলিতে, রোজকার খবরাদি বলিতে সুস্পষ্ট উচ্চারণ শিখিবে ও সংগে সংগে নিজের শব্দ সম্ভার বাড়াইয়া চলিবে এবং বাচনভংগী আয়ত্ত

করিবে। এইভাবে তাহার ভাষাশিক্ষা সুরু হইবে। যখন সে সুস্পষ্ট উচ্চারণে সরল ও শুদ্ধ ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিবে কেবল তখনই তাহার হাতে বই দেওয়া চলে।

বইর প্রতি আকর্ষণ জন্মাইতে শিক্ষক শিশুকে তাহার উপযোগী বই পড়িয়া শোনাইবেন ও ছবি দেখাইবেন। —শুধু ভাষা শিক্ষায় নয়, অন্যান্য সব বিষয়ই বই ছাড়া মুখে মুখে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে শিশু সর্বদা সম্পূর্ণ বাক্যে মনের ভাব প্রকাশ করিবে।

শিশুকে দিয়া প্রথমে কথা বলান এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইতে পারে। শিক্ষক শিশুদের সংগে খোলাখুলিভাবে মিশিলে, তাহাদের সংগে একটু বেড়াইলে তাহাদের জড়তা কাটিয়া যাইবে, তাহারা শিক্ষকের সংগে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবে। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহলকে কেন্দ্র করিয়া কথোপকথন করিলে সমধিক সহযোগিতা আশা করা যায়।

মনে রাখিতে হইবে যে ভাষা শিক্ষা কোন নির্দিষ্ট ঘণ্টাতে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। শিশু সব কাজেই মাতৃভাষা ব্যবহার করিতেছে এবং দিনের সব কাজও খেলার মধ্য দিয়াই শিক্ষক তাহাকে ভাষা শিক্ষা দিবেন।

শিক্ষক শিশুদের সংগে গল্পচ্ছলে নানা কথোকথন করিবেন। শিক্ষক শিশুদের রূপকথার গল্প, পৌরাণিক গল্প,

পরীদের গল্প, গাছপালা ও জীবজন্তুর গল্প, মজার গল্প এবং দেশবিদেশের ছেলেমেয়েদের গল্প বলিবেন। গল্প বলার পর শিক্ষক শিশুদের নিজেদের ভাষায় গল্পের পুনরাবৃত্তি করিতে বলিবেন। এই রকম গল্প শুনিয়া গল্প বলাতে শিশু কথার সংগে কথার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে ও তাহার অর্থসংগতি ঠিক রাখিয়া ধারাবাহিকভাবে কথা বলার অভ্যাস হইবে।

শিশুদের কয়েকটি ছড়া ও কবিতা মুখস্থ করাইতে হইবে। মুখে মুখে বারবার ছড়া বা কবিতা বলিয়া গেলে সহজেই শুনিয়া শুনিয়া শিশুরা মুখস্থ করিতে পারিবে। শিক্ষক যদি অংগভংগীসহ নিজে আবৃত্তি করেন তবে শিশুরা অধিক আনন্দ পাইবে এবং নিজেরাও অনুকরণ করিবে। কবিতা ও আবৃত্তিতে শিশুদের ছন্দের প্রতি আকর্ষণ জন্মাইবে।

অভিনয় করিতে শিশুরা ভালবাসে। ভাষা শিক্ষায় নাটকের ব্যবহার আধুনিক শিশুশিক্ষায় বহুলভাবে প্রচলিত। নাটকের বিষয়বস্তু, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি অভিনেতা শিশুদের বয়সের উপযোগী হইতে হইবে।

শিশুরা বিদ্যালয়ে আসার পরই নিজেদের নাম লেখা কার্ড হইতে যার যার নাম পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে। দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ার, বোর্ড, কাগজ, খড়ি, বই ইত্যাদি কথাও কার্ড হইতে পড়িতে ও লিখিতে শিখিবে। —এ সমস্ত প্রাক্-পঠন ব্যবস্থান্তে শিশুদের পড়া ও লেখা আরম্ভ করিতে হইবে।

শিশুকে বাক্যক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে পড়িতে শেখানই যুক্তিযুক্ত। বাক্যক্রমিক পদ্ধতির মূল সূত্র এই যে (ক) বাক্য দ্বারা পড়া আরম্ভ হইবেঃ (খ) পাঠে বিচ্ছিন্ন বাক্য থাকিবে না ঃ (গ) বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ পরিচিত হইবে এবং (ঘ) শব্দগুলি পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইবে।

শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষক কয়েকটি পাঠ তৈয়ার করিয়া নিতে পারেন। বাক্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ছাত্র বর্ণজ্ঞানলাভ করিবে। কয়টি বর্ণ শেখা হইল শিক্ষক হিসাব রাখিবেন। কতগুলি বর্ণ শেখা হইয়া গেলে শিক্ষক নূতন কোন আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া নূতন পাঠ তৈয়ার করিয়া নূতন বর্ণ, স্বরবর্ণ সংযোগ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করিবেন। বিচ্ছিন্ন বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানদান নিষ্প্রয়োজন।

নীচে কয়েকটি পাঠের নমুনা দেওয়া হইল ঃ *

[শিশু একটি মাটির আম তৈয়ার করিয়াছে। তাহার আগ্রহ মাটির আমে কেন্দ্রীভূত।]

—১ম পাঠ—

	শব্দ ঃ এটা, কী, আম।
এটা কী ?	বর্ণ ঃ এ, ট, ক, আ, ম
এটা আম।	স্বরবর্ণ সংযোগ ঃ আ=া ঃ ঈ=ী

* শিক্ষণ-ব্যবহারিকা-পৃঃ ৯০-৯১

—২য় পাঠ—

আম গাছ কই ?	শব্দ ঃ গাছ, কই, ঐ
ঐ আম গাছ।	বর্ণ ঃ গ, ছ, ই, ঐ

—৩য় পাঠ—

গাছে আম আছে ?	শব্দ ঃ আছে
হাঁ, গাছে আম আছে।	বর্ণ ঃ হ, ঁ
	স্বরবর্ণ সংযোগ ঃ এ=ে

—৪র্থ পাঠ—

কী রকম আম ?	শব্দ ঃ রকম, কাঁচা, পাকা, নাই।
কাঁচা আম।	বর্ণ ঃ র, প, চ, ন
পাকা আম নাই।	

—৫ম পাঠ—

কাঁচা আম টক।	শব্দ ঃ টক, নয়, ভাল
কাঁচা আম ভাল নয়।	বর্ণ ঃ ট, ভ, ল
পাকা আম টক নয়।	
পাকা আম ভাল।	

প্রত্যেকটি বাক্য বড় বড় করিয়া কার্ডে লিখিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেকটি বাক্যের কয়েকখানা করিয়া কার্ড থাকিবে। বাক্যের বিভিন্ন শব্দগুলি পৃথক করিয়া কাটিয়া রাখিতে হইবে। প্রতি বাক্যের কার্ডে একখানি করিয়া ছবি থাকিলে ভাল হয়। শিক্ষক প্রত্যেকখানি কার্ড ছাত্রদিগকে

দেখাইবেন, বাক্যের অর্থবোধক ছবি দেখাইবেন, বাক্যটি পূর্ণভাবে উচ্চারণ করিবেন এবং ছাত্রগণ শিক্ষকের অনুকরণে বাক্যটি উচ্চারণ করিবে। বাক্যটি শিক্ষক ও ছাত্রগণ কয়েকবার উচ্চারণ করার পরে, অনেকগুলি কার্ডের মধ্য হইতে বিশেষ একটি বাক্যের কার্ড খুঁজিয়া বাহির করা, ছবির সংগে লিখিত বাক্য মেলান, পৃথক পৃথক শব্দ মিলাইয়া একটি বিশেষ বাক্য-গঠন প্রভৃতি খেলা দেওয়া যাইতে পারে।

লেখা-শেখা ঃ শিশুকে লিখিতে শিখাইতে আরম্ভ করিবার পূর্বে দেখিতে হইবে যে যে-সকল শব্দ শিশুরা লিখিবে সেগুলির দৃশ্যরূপের সংগে শিশুদের পরিচয় যথেষ্ট গভীর হয়। ইহাও দেখিতে হইবে যে শিশুদের হাত ও আংগুলের পেশীগুলি তাহাদের আয়ত্তাধীন হইয়াছে। পেশী আয়ত্তাধীন না হইলে তাহারা অক্ষর রেখায় ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না। ছয় বৎসরের শিশুর সাধারণত পেশী আয়ত্তীকরণের ক্ষমতার উন্মেষ হইলেও, তাহার বহু অভ্যাসের দ্বারা পেশীগুলিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে হয়। লিখিবার ক্ষমতার দ্রুত বিকাশের জন্য শিশুকে ইচ্ছামত আঁকিতে, হিজিবিজি কাটিতে দেওয়া যাইতে পারে। যথেচ্ছ আঁকিতে আঁকিতে বা হিজিবিজি কাটিতে কাটিতে শিশু নিজের অজ্ঞাতে ভবিষ্যতের হাতের লেখার ভিত্তিস্থাপন করে। হিজিবিজি হইতে অক্ষরের আকৃতি বাহির করিয়া পরে অক্ষরে পরিণত করার কৌশল শিশুকে শিখাইয়া দিতে হইবে।

পড়িতে আরম্ভ করার পূর্বেই শিশু কার্ড হইতে নিজের নাম ছবি হিসাবে চিনিয়াছে। দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, বই ইত্যাদি শব্দও সে ছবি হিসাবে চিনিয়াছে। নাম ও এইরূপ অতি-পরিচিত শব্দগুলি শিশুরা ছবি হিসাবেই আঁকিয়া বা লিখিয়া ফেলিবে।

"কেবলমাত্র হস্তলিপি ও শ্রুতলিপির দ্বারা লেখা অভ্যাস করালে শিশুরা কেবল যান্ত্রিকভাবেই লিখতে শেখে, সহজ মনের ভাবকে স্বাভাবিক প্রকাশ করার ক্ষমতা তাদের জন্মায় না।"

"প্রথম থেকে শিশুদের এমন বিষয় লিখতে দিতে হবে, যা তাদের কাছে বাস্তব এবং অর্থপূর্ণ; তাদের দৈনিক জীবনের কাজকর্ম, গান, গল্প, খেলা এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতার সংগে যা নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রথম থেকেই শিশুদের এমনভাবে লিখতে শিখাতে হবে, যাতে তারা লেখাকে নিজেদের মনের ভাব ব্যক্ত করবার একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রণালী ব'লেই বোঝে—কেবলমাত্র একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব'লে মনে না করে।"

"যতদিন না শিশুরা অনায়াসে লিখতে শেখে ততদিন হাতের লেখার সৌষ্ঠবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া চলবে না। কোনও মতে দুই একটি সহজ বাক্যকে রেখায় ফুটিয়ে তোলাই যে শিশুর পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাকে আবার সুন্দরভাবে লিখার তাগিদ দিলে বেচারী বিপর্যস্ত হয়ে

পড়বে। বরঞ্চ, সে লিখতে শিখেছে সেইজন্য তাকে প্রশংসা করলে ও উৎসাহ দিলে সে আরো বেশী ক'রে লিখবে এবং ক্রমে তাহার হস্তলিপির উন্নতি হবে। শিক্ষকের নিজের হস্তলিপি সুষ্ঠু হওয়া অবশ্য প্রয়োজন, কারণ অনবরত সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখলে শিশুরা সহজেই সুন্দরভাবে লিখতে শেখে। যে শিশুরা সুন্দর লিখতে পারে তাদের বিশেষভাবে প্রশংসা করলেও বাকি সব কয়টি শিশুর মনে সুন্দরভাবে লিখবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা জন্মায়।" *

---

* শিক্ষণ-ব্যবহারিকা : পৃঃ ৯৭

॥ গণিতশিক্ষা ॥

বিদ্যালয়ে বা বাড়ীতে কাজ করিতে হইলেই শিশু হিসাবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবে, আর হিসাব করিতে হইলেই শিশু গণিত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিবে। আগে গণিত যান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসাবে শেখান হইত এবং বাস্তব জীবনে শিশু ইহার দরকার কী বুঝিতে পারিত না। এজন্য অনেক-ক্ষেত্রে গণিত শিশুর নিকট অহেতুক ভয়ের বস্তু হইয়া থাকিত। "শিশুর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, যেমন বাগানে ক'টা গাছ বা বীজ পোতা হল, কতজন কাজ ক'রল, কতক্ষণ কাজ ক'রল, কত তার সূতা কাটল ইত্যাদি অবলম্বনে স্বাভাবিক উপায়ে শিশু অঙ্ক শিখবে। যখনই অঙ্কের কোন বিষয় শিশু শিখবে তার বারবার আলোচনার প্রয়োজন হবে।"

আকার, আয়তন, ওজন, পরিমাণ, সময়, পরিমাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে অতি সাধারণ ধারণা শিশু বিদ্যালয়ে আসার পূর্বেই লাভ করে। শিশুর পূর্বলব্ধ ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যালয়ে অংকের কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে এমন কাজকর্মের ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে শিশুর ঐ সব বিষয় সম্বন্ধে অধিকতর পরিচয়লাভ হয়।

সংখ্যার পরিচয়, বাস্তব কোন জিনিষ, ছবি বা কাজের ভিতর দিয়া দেওয়া উচিত। "তোমার কয়টি চোখ, কয়টি কান? তোমার হাতে কয়টি আংগুল? তোমরা কত

ভাই বোন? এ ঘরে কয়টি জানালা? এরকম প্রশ্নের সাহায্যে শিশুকে সংখ্যা বলার অভ্যাস করান যাইতে পারে। সংখ্যা সম্বলিত ছড়ার সাহায্যে সংখ্যা বলার অভ্যাস করাইলে শিশুরা আনন্দের সংগে শিখিতে পারে। সংখ্যা বলাতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে সংখ্যা পড়া ও লেখা আরম্ভ করা যাইতে পারে। সংখ্যা পড়ান আরম্ভ করিলেই শিক্ষক মনযোগী হইবেন যেন শিশুরা ক্রমিকভাবে সংখ্যাগুলি পড়ে ও শেখে।

শ্রেণীকক্ষে 'ক্যালেণ্ডার' টাঙান থাকিলে ছাত্রেরা তারিখ জানিতে গিয়া ৩১ পর্যন্ত পড়িতে শিখিতে পারে। পাঠ্য বইর পৃষ্ঠা দেখিয়া আরও অনেক দূর পর্যন্ত সংখ্যা পড়িতে শেখা যায়।

কোন জিনিষ একটি থাকিলে এক বলে এবং চারটি একসংগে থাকিলে চার বলে—এ জ্ঞান শিশু তাহার অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করিবে। তবে এ ধারণা বদ্ধমূল করার জন্য সংখ্যা-ছক ইত্যাদি ব্যবহার আবশ্যক।

সংখ্যা বলা ও পড়ার সময় শিশু যে সংখ্যাগুলি শিখিবে সেগুলি সে অংকে ও কথায় লিখিবে। শিক্ষক 'বোর্ড' এ বা মেজেতে সংখ্যাগুলি পর পর লিখিবেন—তাঁহার লেখার উপর ছাত্রেরা লিখিবে। শিশু তাহার কাজকর্ম উপলক্ষে যত বেশী বিভিন্ন সংখ্যার সংস্পর্শে আসিবে ততই তাহার সংখ্যা চেনার ও লেখার সুযোগ আসিবে।

পল্লীঅঞ্চলের ছেলে-মেয়েরা দোকান হইতে জিনিষপত্র কেনা উপলক্ষে ওজনের সংগে কিছুটা পরিচিত থাকে। সেই অভি-

জ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া বিদ্যালয়ে খেলার দোকান খোলা যাইতে পারে। এইভাবে খেলার মাধ্যমে সের, আধাসের, পোয়া, ছটাক ইত্যাদি সম্বন্ধে শিশুদের ধারণা দেওয়া যাইতে পারে।

আংগুল, বিঘত, হাত, গজ, ফুট ইত্যাদি রৈখিক মাপ সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইবার জন্য ছাত্রদের বাগান, শ্রেণীকক্ষ, বিদ্যালয়ের সামনের মাঠ মাপিতে বলা যাইতে পারে। ছাত্রেরা একে অন্যের উচ্চতা মাপিতে পারে।

শিশু কখন ঘুম হইতে ওঠে, কখন স্কুলে যায়, কখন ছুটী হয়, কখন বাড়ী আসে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সময় সম্বন্ধে শিশুর প্রাথমিক ধারণা জন্মাইতে পারে। এগুলির উত্তরে শিশু হয়ত বলিবে—ভোরবেলায় সে ঘুম হইতে ওঠে, সকালে স্কুলে যায়, দুপুরে ছুটি হয় ইত্যাদি। এই সময়গুলির সংগে যদি ঘড়ির সম্বন্ধে দেখান যায় তাহা হইলে শিশুর সময় সম্বন্ধে ধারনা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে।

'ক্যালেণ্ডার' —এর সাহায্যে শিশুকে বিভিন্ন বারের নাম ও কয়টি বার আছে শেখান যাইতে পারে। তারপর শিক্ষক বলিয়া দিবেন যে সাতটী বার নিয়া এক সপ্তাহ হয়। 'ক্যালেণ্ডার' —এর সাহায্যেই মাসের নাম—কোন্ মাসে কত দিন, কত সপ্তাহ ও কয় মাসে এক বৎসর—এই সকল কথা শেখান যায়।

প্রকৃত টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, ডবল-পয়সা, পয়সা দেখাইয়া শিক্ষক কোন্ মুদ্রার কী নাম শিখাইবেন।

নাম শিখাইবার সংগে সংগে কত পয়সায় বা ডবল-পয়সায়, এক আনা, কত আনায় এক দুয়ানি, সিকি, আধুলি ও টাকা এবং কত দুয়ানিতে, সিকিতে, বা আধুলিতে এক টাকা ইত্যাদি শিখাইবেন।

সংখ্যা গণনা, যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কে বল-ফ্রেম বা Abacus—এর ব্যবহার শিশুদের পক্ষে আনন্দদায়ক ও কার্যকরী হইয়া থাকে।

যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ অংক শিখাইবার কালে শিক্ষক উদ্দিষ্ট প্রক্রিয়ার অর্থ ও উদ্দেশ্যে ছাত্রদিগকে স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিবেন এবং শিশুর দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সংগে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ছোট ছোট সমস্যামূলক প্রশ্ন সমাধানের মাধ্যমে অংক শিখাইবেন।

নামতা শেখান সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি স্মরণীয় ঃ—

(১) নামতা সঠিক ভাবে মুখস্থ রাখা আবশ্যক ঃ

(২) নামতা শিক্ষক শ্রেণীতে মুখস্থ করাইবেন—মুখস্থ করার আগে শিশুরা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবে ঃ

(৩) প্রতিদিন ১০ মিনিটের অনধিক সময় ছাত্রেরা নামতা মুখস্থ করিবে ঃ

(৪) আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া নামতা শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ঃ এবং

(৫) শিশুরা যেন প্রথম হইতে আবৃত্তি না করিয়াই প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিতে পারে।

॥ পরিবেশ-পরিচিতি ॥

এ যাবতকাল শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে আমাদের দেশে ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় কৃত্রিম উপায়ে, পাঠ্য পুস্তককে ভিত্তি করিয়া শেখান আরম্ভ হইত এবং ঐ সমস্ত বিষয় শেখা অর্থ কতগুলি সন-তারিখ, নাম ইত্যাদি মুখস্থ-করা বুঝাইত। "জ্ঞানের এই যে অসম্পূর্ণতা, দৃষ্টিভংগীর এই যে অভাব, তার পরিবর্তন দরকার। নইলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আবিস্কারকের মনোবৃত্তি নিয়ে, সন্ধানী দৃষ্টিভংগী নিয়ে আমাদের শিশুরা তাদের পরিবেশকে সম্যকরূপে জানতে শিখুক, বুঝতে শিখুক, উপলব্ধি করতে শিখুক, এবং সেই লব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক। নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান কতখানি স্থান জুড়ে আছে এবং অলক্ষ্যে তা তাদের জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে—তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তারা আহরণ করুক। তবেই ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।"

এ আদর্শ অনুসারে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞানের কোন পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা নাই। পরিবেশ-পর্যবেক্ষণ ও পরিচিতির মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে অনুসন্ধানের সঠিক মনোভাব গঠিত করিয়া জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে।

"পৃথিবী গোল না চ্যাপ্টা, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে

না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে—এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারাটা শিশুর পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়—কিন্তু গ্রামের উত্তর পাড়ায় জেলেদের বসতি, দক্ষিণ পাড়ায় কয়েক ঘর নাপিত আছে, গ্রামের রাস্তার শেষদিকে বামধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে—এই সব তথ্য সংগ্রহ শিশু খুব আনন্দের সঙ্গেই করতে চায়। রথের মেলায় কত লোক জড় হয়—কত রকম খেলনা, খাবার আসে ইত্যাদি বিষয়ে শিশু আগ্রহান্বিত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্য দিয়ে শিশুর ভূগোলের প্রথম জ্ঞান দেওয়া হবে এবং ধীরে ধীরে তাকে কার্যকারন সম্বন্ধে খুঁজে বার করতে উৎসাহিত করা হবে।"

"মাতৃভাষা শিক্ষার সময়ই নানারূপ গল্পচ্ছলে শিশুর বাচনভঙ্গী বৃদ্ধি করার সংগে সংগে ভূগোলের জ্ঞান দিতে হবে।"

শিক্ষক মাঝে মাঝে ছাত্রদের বেড়াইতে লইয়া যাইবেন—ভ্রমণের কালে শিশুরা যাহা দেখিল তাহার ছবি আঁকিবে। শিশুরা শ্রেনী-কক্ষের, বিদ্যালয়ের, বিদ্যালয়ে আসার পথের নক্‌সা আঁকিবে। নিজেদের পরিবেশের মধ্যে পাখীর বাসা, নানারকম পোকামাকড়, ফল, ফুল পাতা ইত্যাদি সংগ্রহ করিবে। ধান, পাট, নানারকম শাকশব্জী কখন, কীরকম জমিতে আবাদ হয়, কখন পাকে, কখন কাটে ইত্যাদি শিশু লক্ষ্য করিবে ঃ শিক্ষক মহাশয় এ সকল সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং এ সকল হইতে কীভাবে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত হয় বুঝাইয়া দিবেন। শিশু লক্ষ্য করিবে কোন্‌ ঋতুতে,

কোন্ গাছে, কতদিনে কী ফুল বা ফল হয়। এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে কীভাবে যাওয়া যায়, গ্রাম হইতে সহরে কীভাবে লোকজন যায় ইত্যাদি আলোচনায় শিশুকে যানবাহন সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যায়।—এইভাবে পরিবেশ-পরিচিতির মাধ্যমে ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান শেখান আরম্ভ করা যাইতে পারে।

প্রারম্ভিক স্তরে ঐতিহাসিক কাহিনী বলা যাইতে পারে। "গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করা, ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করা, কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করে নিজেকে অতীতের লোকদের সঙ্গে এক করে ফেলা, এই অভিজ্ঞতাগুলি ইতিহাস শেখার পর্যায়ে পড়ে।"

"প্রকৃতিপাঠের জন্য সব্জী ও ফুলের বাগান প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। বিদ্যালয়ের জমির খানিকটা অংশকে ছোট ছোট ক্ষেত্রে বিভক্ত ক'রে সেগুলিকে চাষের উপযুক্ত করে তৈরী করে দিয়ে তাতে ছেলেমেয়েদের বীজ বপন করতে যদি দেওয়া হয় এবং একটি দলকে এক একটি ক্ষেত্র চাষ করার জন্য যদি দেওয়া হয় তবে বাগানের কাজের ভেতর দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ জন্মাবে—নিজের ভূমিটীকে ফুলফলে সুন্দর করে তুলতেই যে হবে তাকে। উপরন্তু অঙ্কুরোদগম, শিশু উদ্ভিদের বৃদ্ধি তাপ, জল ও মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় তা পরীক্ষা করতে পারবে এবং উদ্ভিদের 'শত্রু ও বন্ধুদের' সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।"

"অত্যন্ত স্বাভাবিক আগ্রহের সঙ্গে শিশুরা আবহাওয়ার

পরিবর্তন ও সেই সঙ্গে ঋতু পর্যবেক্ষণ করবে, কারণ আবহাওয়ার দ্বারা তাদের খেলধূলা ও অন্যান্য কাজ প্রভাবান্বিত হয়। * * * সকালে সূর্য আকাশের কোন্ স্থানে অবস্থান করে, কখনই বা মাথার উপর আসে আবার কখনই বা হেলে পড়ে, ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিমাপ, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, নক্ষত্রভরা আকাশ, কোন্‌দিন ঝড় হ'ল, কোন্‌দিন বৃষ্টি হ'ল—এসব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী শিশুরা ছবি এঁকে বা কথায় লিখে প্রতিদিন লিপিবদ্ধ ক'রতে পারে।"

"হাট বাজার বা মেলায় শিশুদের মাঝে মাঝে নিয়ে গেলে তারা পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে, বেচা-কেনা সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন তো করবেই উপরন্তু কি কি শাকশব্জী, জীবজন্তু বাজারে বিক্রয়ের জন্য আসে তা দেখবার সুযোগ পাবে। তাছাড়া বিভিন্ন গ্রামের বা পল্লীর মানুষ, তাদের বিচিত্র পোষাক ইত্যাদি দেখবার অবকাশও মিলবে।"

হাট বাজারে বেচা-কেনা দেখিয়া শিশু আর একটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তাহা এই যে সব গ্রাম বা সহরের মানুষই জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরনির্ভরশীল। সুতরাং, সুস্থ জীবন যাপনের জন্য পাশাপাশি গ্রামের বা সহরের লোকের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও জাতির শান্তিতে ও বন্ধুত্বে বাস করা দরকার। সভ্যতা মানে দেওয়া-নেওয়া এবং তার জন্য দরকার পরস্পরের সম্প্রীতি।*

* শিক্ষণ-ব্যবহারিকা—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাধিকার।

॥ ডল্টন প্ল্যান ॥
(Dalton Plan)

শ্রেণীবদ্ধভাবে পাঠদানে মেধাবী ছাত্রদের পাঠের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ঃ অপরদিকে, অল্প মেধাবী ছাত্র শ্রেণীর সংগে সমানতালে অগ্রসর হইতে পারে না। শ্রেণীগত পাঠদানের এ অসুবিধা দূর করিয়া প্রতি ছাত্রের প্রতি মনোযোগ দিবার উদ্দেশ্যে মিস্ হেলেন পার্খহার্ষ্ট "ডল্টন প্ল্যান" নামে এক শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। আমেরিকায় ডল্টন নামক এক স্থানে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম এ পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। সেস্থানের নাম অনুসারেই এ পদ্ধতির নামকরন হয়।

ছাত্রগণকে এক এক শ্রেণী হিসাবে দলবদ্ধ করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক ছাত্রদিগকে একত্রিত করিয়া নির্দিষ্ট বিষয় তাহারা কী শিক্ষালাভ করিবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন ও নির্দেশাদি দেন, কিন্তু শ্রেণীগতভাবে পাঠদান করেন না। ছাত্রগণকে এক সংগে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (সাধারনত এক মাস) কাজ 'Assignment' ঠিক করিয়া দেওয়া হয় এবং ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় তাহা শিক্ষা করিতে বলা হয়।

এক এক বিষয়ের জন্য এক একটি ঘর নির্দিষ্ট থাকে। সেখানে নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তক, ছবি, 'চার্ট' ইত্যাদি সাজান থাকে। বিদ্যালয়ে কোন সময় পত্রিকা (Time table) থাকে না। ছাত্রগণ শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনায় জিজ্ঞাস্য সব কিছু জানিয়া লয়। সময়-পত্রিকা না থাকিলেও দিনের সময়কে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হয়—প্রথমভাগে প্রধান প্রধান বিষয়ের 'assignment'-এর কাজ করিতে হয়।

ছাত্রগণ যখন যে বিষয় শিক্ষা করার ইচ্ছা করে বা প্রয়োজনবোধ করে তখন সেই বিষয়ের শিক্ষকের ঘরে গিয়া যতক্ষন খুসী সে বিষয় আলোচনা করিতে বা পড়িতে পারে। ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয় পড়িয়া তাহার সারমর্ম লেখে। শিক্ষক তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রতিটি ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির রেখাচিত্র (Graph) প্রস্তুত করেন। ইহা ছাড়া "ডল্টন প্ল্যান"—এ অন্য কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই।

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে ছাত্রগণ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়, তাহারা যথেষ্ট স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং ফলে তাহাদের আত্মনির্ভরশীলতা শেখা হয় ও দায়িত্বজ্ঞান বাড়ে। একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এ ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর ছাত্রকে বিশেষ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন।

তবে ইহা নিম্নশ্রেণীর উপযোগী নয় এবং ইহা সকল বিষয় শিক্ষার সমান উপযোগী নয়। এ ব্যবস্থায় ছাত্রের উপর অত্যধিক দায়িত্ব স্থাপন করা হয় এবং মেধাবী ছাত্রেরাই ইহার উপকার লাভ করিতে পারে। কমবুদ্ধি ছাত্রের পক্ষে ইহা তেমন উপযুক্ত নয়। তবে শ্রেণীপাঠনার অনুপূরকভাবে ইহার ব্যবহার করিলে ছাত্রগণ এ পদ্ধতি দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতে পারে।

শিক্ষক বিভিন্ন ছাত্রের পাঠে অগ্রগতির তাল বিভিন্ন, এ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া এ পদ্ধতির মৌলিক নীতি সম্বন্ধে সজ্ঞান থাকিলে শ্রেণীগত পাঠনার অসুবিধা বহু পরিমাণে দূর করিতে পারেন।

॥ কার্য-সমস্যা পদ্ধতি ॥

(Project Method)

স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কার্যরূপ সমস্যা সমাধানের আকারে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে কার্য-সমস্যা পদ্ধতি (Project Method) বলে। এ পদ্ধতিতে একটা সমস্যা ছাত্রের সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং ছাত্র নিজ চেষ্টায় সে সমস্যা সমাধান করে।

সমস্যা দুই প্রকার হইতে পারে—(ক) বুদ্ধিমূলক ও (খ) কার্যমূলক। বুদ্ধিমূলক সমস্যা সমাধানে কোন কার্য করিতে হয় না—সমাধানের কল্পিত কার্যপদ্ধতি নির্ধারন করিতে পারিলেই সমস্যাটির সমাধান হয়। কার্যমূলক সমস্যা সমাধানে ছাত্রকে হাতে কলমে কাজটি করিতে হয়।

এই পদ্ধতিতে ছাত্রদিগকে চারিটি স্তরে কার্য শেষ করিতে হয়।

(ক) কাজের জন্য কয়েকজন মিলিয়া দল করা ঃ

(খ) কাজের পরিকল্পনা করা ঃ

(গ) কাজ সম্পাদন করা ঃ এবং

(ঘ) কাজের বিচার করা।

এ পদ্ধতিতে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা হয় বলিয়া শিক্ষা সমধিক কার্যকরী হয়, ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাইবার সুযোগ হয় ও শিক্ষার সংগে বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

স্থাপিত হয়। একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য সামনে থাকায় ছাত্রগণ অধিক আগ্রহের সংগে শিক্ষালাভ করে এবং ইহাতে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়।

একথা স্বীকার্য যে এ পদ্ধতির সাহাযে শিক্ষা সম্পূর্ণ করা কঠিন, কারণ এ পদ্ধতি অবলম্বনে বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক জ্ঞানদান সম্ভব নয়। তবে, "ডল্টন্ প্ল্যান"-এর ন্যায়, শ্রেণীগত পাঠনার অনুপূরক হিসাবে এ পদ্ধতি অনুসরণ করিলে বর্তমান কিতাবী শিক্ষার অনেক দোষত্রুটী শোধরান যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে ছাত্রগণ ছোট ছোট কার্য-সমস্যা সমাধান করিতে পারে। তবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিবেশে কার্য সম্পাদন করিতে ছাত্রগণকে বাহিরেও লইয়া যাওয়া যাইতে পারে।

বৎসরের প্রথমেই বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করার কালে কতগুলি কার্য-সমস্যার আকারে এক এক বিষয়ের পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করিয়া লওয়া সুবিধাজনক।

॥ স্বাস্থ্য-শিক্ষা ॥

আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে ভয়াবহ অজ্ঞতা বিরাজমান এবং এই অজ্ঞতার ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের মান অতি নৈরাশ্যজনক। আমাদের গড়পড়তা আয়ু অত্যন্ত কম এবং শিশু মৃত্যু ও অকাল মৃত্যুর হার অনেক বেশী। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য আমাদের দেশের ভাবীপুরুষ আজ যাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র তাহাদের স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া দরকার। সুতরাং এ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়িত্ব অনেক।

"বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষকেরা ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে আসবেন তাদের ৫।৬ বৎসর বয়সের সময় থেকে। এত দেরীতে শিশুদের সংস্পর্শে আসার দরুন তাঁদের কাজ কিছুটা জটিল হয়ে পড়বে তাতে সন্দেহ নাই। কারণ অশিক্ষিত মা-বাপের কাছ থেকে ছেলেরা তো সাধারণতঃ স্বাস্থ্যশিক্ষা পেতেই পারে না, বরঞ্চ, অনেক ক্ষেত্রে বহু অস্বাস্থ্যকর কু-অভ্যাস ঐ ৫।৬ বৎসর বয়সের মধ্যেই তারা গঠন করে। তবুও নিষ্ঠা এবং উৎসাহের সংগে কাজ করে গেলে সুফল পাওয়া যাবে সন্দেহ নাই।"

স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবহারিক ও অভ্যাসমূলক হইতে হইবে—শুধু বক্তৃতা বা উপদেশ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষক নিজে নিষ্ঠাসহকারে পালন করিবেন ও ছাত্রেরা

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় নির্দেশাদি পালন করে কিনা তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ করিতে হইবে।

শিশুর স্বাস্থ্যবিধি পালন বিষয়ে শিক্ষক ও শিশুর পিতামাতার সংগে সহযোগিতা স্থাপন আবশ্যক ও শিক্ষক মাঝে মাঝে গ্রামবাসিগণের সহযোগিতায় গ্রাম-সাফাই ইত্যাদি কার্য করিবেন এবং ছাত্রেরা সেকাজে যোগ দিবে।

পরিচ্ছন্নতা (ব্যক্তিগত ও সামাজিক) স্বাস্থ্যবিধির গোড়ার কথা। তাই শিশুর স্বাস্থ্যশিক্ষা আরম্ভ হইবে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা দিয়া। উপদেশ দিয়া এ শিক্ষা হয় না—হাতে নাতে করিয়া দেখাইতে হইবে। "শিশুদের মাথা, চুল, চোখ, কান, নাক, দাঁত, জিভ, হাত, পা ও নখ পরিষ্কার আছে কিনা দেখতে হবে। দরকার হলে—এবং প্রথম প্রথম দরকার হবেই—শিক্ষক নিজেই শিশুর দাঁত মেজে, চোখ-মুখ ধুইয়ে, চুল আঁচড়িয়ে, হাত পায়ের নখ কেটে, হাত-পা ভাল করে' রগড়ে ধুয়ে এবং নাক কান পরিস্কার করে দেবেন। দুচারদিন এভাবে করলেই শিশুদের নিজেদের ও তাদের অভিভাকবদের মনে একটা স্বাস্থ্য-চেতনা জাগবে এবং তাহলে এর পরে স্বাস্থ্যনীতিগুলি মোটামুটিভাবে পালিত হবে বলে আশা করা যেতে পারে।"

শিশুদের সকালে ওঠার অভ্যাস, সকালে উঠিয়া মলমূত্র-ত্যাগের অভ্যাস, নিয়মিত উপযুক্ত পরিমাণে শারীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস, ঠিকভাবে বসা, দাঁড়ান ও চলার অভ্যাস

এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশে উপযুক্ত পরিমাণ নিদ্রা ও বিশ্রামের অভ্যাস গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষায় উপযুক্ত পরিমাণ নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা শিশুদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিশুরা মুখ বুজিয়া, কাৎ হইয়া শুইয়া ঘুমাইবে।

উপযুক্ত পরিমানে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহন ও পরিচ্ছন্নভাবে খাদ্য প্রস্তুত, পরিবেশন ও গ্রহনের গুরুত্ব শিশুদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। "খাবার পূর্বে ও পরে ভাল করে হাত মুখ ধোওয়া প্রয়োজন এবং খাবার জায়গাটি ভাল করে পরিস্কার রাখা দরকার। শিশুদের ধীরে ও সুস্থ ভাবে খাদ্যদ্রব্য ভাল করে চিবিয়ে খেতে শেখাতে হবে। * * যতদূর সম্ভব প্রত্যহ একই সময়ে খাওয়া উচিত। লোভের বশে অতিরিক্ত খাওয়া অনিষ্টকর ঃ তাড়াহুড়া করে খেলে সে খাবার ভাল হজম হয় না ; এ সকল বিষয় শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে।"

পোষাকের প্রয়োজীয়তা এবং ঋতুভেদে ও বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন পোষাকের প্রয়োজনীয়তা শিশুদের বুঝাইয়া দিতে হইবে।

দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ও কর্মক্ষমতা অটুট রাখিতে কাজের মতই বিশ্রামও প্রয়োজনীয় এ জ্ঞান শিশুকে দিতে হইবে।

উপরোক্ত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি জানা ও মানার সংগে সংগে শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিবেশও স্বাস্থ্যপ্রদ করিয়া তুলিতে হইবে। বিদ্যালয় গৃহে উপযুক্ত আলো-বাতাসের

ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের মলমূত্র ত্যাগের উপযুক্ত নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-চর্চা ও খোলা জায়গায় খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকিবে। শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য যথেষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ছাত্রদের দৈহিক উচ্চতা ও সংখ্যা অনুসারে নির্মিত হইবে। বিদ্যালয়ের সময় পত্রিকার বিভিন্ন বিষয়ের জন্য এমনভাবে সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রগণ একঘেয়েমি বা অবসাদ বোধ না করে এবং তাহাতে খেলাধূলার জন্য যথেষ্ট সময় পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

দেহের পুষ্টির জন্য (বিশেষত শিশুদেহের) কী জাতীয় খাদ্য, কী পরিমান আবশ্যক এবং ঋতুভেদে খাদ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা শিশুদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। সচরাচর সুলভ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যমূল্য এবং ভিটামিন ও বিভিন্ন প্রকার লবন প্রভৃতি গ্রহনের অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে ছাত্রদের জ্ঞানদান করা আবশ্যক। রোগীর পথ্য ও পথ্যাদি প্রস্তুতিকালে অবলম্বনীয় সতর্কতা সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে অবহিত করিতে হইবে।

গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়াদি সম্বন্ধে শিশুদিগের জানা দরকার। গ্রামের জল সরবরাহের ব্যবস্থা, পাণীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত জলের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা, গ্রামের বাসগৃহ কীরকম জায়গায়, কীভাবে নির্মিত হওয়া

উচিত, মলমূত্র ত্যাগের উপযুক্ত ব্যবস্থা, আবর্জনাদি নিকাশের ব্যবস্থা, গ্রামের পথঘাটের পরিচ্ছন্নতা, সাধারণ সংক্রামক ব্যাধিগুলির কারণ, সংক্রমণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা, গ্রামে মেলা বা অন্যান্য কারণে জনসমাগম হইলে কী কী সাবধানতা অবলম্বনীয়—এ সকল বিয়য় শিশুরা জানিবে।

কতগুলি সাধারণ রোগ—তাহাদের কারণ ও সহজ প্রতিকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিশুদের জানা দরকার। এ সকল রোগের মধ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, অপরিস্কার দাঁত জনিত বিভিন্ন রোগ, মাথায় উকুনের উৎপাত, চোখ বা কান দিয়া জলপড়া, বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ, বিষাক্ত ঘা ও ফোঁড়া, পেটের-অসুখ, আমাশয়, বমি ও নানাপ্রকার জ্বর উল্লেখযোগ্য।

মশা, মাছি ও নানাপ্রকার পোকামাকড়, ছারপোকা, ইঁদুর প্রভৃতির অপকারিতা এবং বাড়ীর কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মোরগ প্রভৃতি হইতে যে সব রোগ ছাড়ায় সেগুলি সম্বন্ধেও শিশুরা জানিবে।

আকস্মিক দুর্ঘটনায় রক্তপাত হইলে, হাড় ভাঙিলে বা মচকাইলে অথবা বিষাক্ত কোন প্রকার কীট দংশন বা সর্পঘাতে ও পাগলা কুকুর কামড়াইলে কী কী প্রাথমিক সাহায্য (First-aid) করা উচিত, বিভিন্ন প্রকার 'ব্যাণ্ডেজ'-বাঁধা, আহত বা রুগ্ন ব্যক্তি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া

যাওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষক ছাত্রদিগকে হাতে-নাতে শিখাইবেন।

গ্রাম্য সমাজে শিক্ষক নানা প্রয়োজনীয় খবরও পৌঁছাইয়া দিবেন। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের ও চিকিৎসা বিভাগের কোথায় কী প্রতিষ্ঠান আছে সে সম্বন্ধে নিজে জানিবেন ও গ্রামবাসীগণকে জানাইবেন যাহাতে তাহারা ঐ সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সেবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে।

॥ চারুশিল্প-হস্তশিল্প ॥

সংগীত ঃ "শিল্পের মধ্যে ললিত তথা চারুকলার স্থানই হল প্রধান। চারুকলার প্রকাশ চিত্র, ভাস্কর্য ও সঙ্গীত দিয়ে পরিপূর্ণ। এতিনের ভাব সৌন্দর্যের তুলনা নাই। কিন্তু তাহলেও শিল্পবিদ্‌রা সঙ্গীতকেই শ্রেষ্ঠ কলা বলেছেন। * * সঙ্গীত বলতে বুঝায় গীত, বাদ্য ও নৃত্য ঐ তিনের সমন্বয় অর্থাৎ আদর্শ সঙ্গীত হবে গান, বাজনা ও নাচের একত্র সমাবেশ। * * মানব-শিক্ষার সৃষ্টি হতে বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারেও সংগীত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।" তাই নূতন শিশুশিক্ষা-ব্যবস্থায় সংগীতকে এক বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে যে সকল সংগীত শেখান হইবে সেগুলিকে কয়টী ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ

(১) জাতীয় সংগীত ঃ জাতীয় সংগীত শুদ্ধ ভাবে গাইতে সকল শিশুকে শিখাইতে হইবে।

(২) সরল লোক সংগীত

(৩) ভজন বা ধর্মসংগীত

(৪) কর্মসংগীত (Action Song)

এর প্রত্যেক জাতীয় সংগীতের নমুনা স্বরলিপিসহ "শিক্ষণ ব্যবহারিকা"-য় দেওয়া আছে (পৃঃ ১৫০—২০২)

"সংগীত শিক্ষায় সকলের চাইতে বড় লক্ষ্য হল, শিশুর আনুভূতিক বিকাশকে সাহায্য করা।"

সংগীত শিক্ষার সময় একসংগে ২০।৩০ মিনিটের বেশী

হওয়া উচিত নয়। প্রথমে শিক্ষক সম্পূর্ণ গানটী একবার ছাত্রদিগকে শোনাইবেন। তারপর শিক্ষক একছত্র গাইবেন—ছাত্ররা তাঁহার সংগে সংগে গান করিবে। শিশুদের সংগীতের তালরক্ষার জন্য ১, ২, ৩ বলিয়া আরম্ভ করিতে হইবে এবং গানের সংগে সংগে শিক্ষকের অনুকরণে হাতে তালি দিয়া তাহারা তাল রাখিতে শিখিবে।

সংগীত শিক্ষক নিজে যদি সুগায়ক না হন, তাহা হইলে তিনি স্থানীয় কোন সুগায়কের সাহায্য নিবেন। শিশুদের সামনে কখনই সংগীতের অপকৃষ্ট নমুনা ধরা যাইবে না।

ছাত্রগণ কয়েকটী সরল অথচ সুবিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখিবে। শিশুদের উপযুক্ত নাটক অভিনয়ে ও লোক নৃত্য চর্চায় উৎসাহী করিতে হইবে।

অংকন ও চিত্রকলা: অন্যান্য সমস্ত সৃজনাত্মক কাজের মত অংকন ও চিত্রকলার জন্য পরিবেশই মুখ্য। উপযুক্ত পরিবেশে শিশুকে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে দেওয়ার অর্থ অযাচিত উপদেশ-নির্দেশাদি না দেওয়া।

ছাত্রদিগকে প্রথমে বালুর বা 'শ্লেট'-এর উপর আঁকিতে দেওয়া যাইতে পারে। নানারকম রং ও রং-মেশান সম্বন্ধে তাহাদিগকে কিছু উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম তাহাদিগকে তাহাদের চেনা গাছপালা বা জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকিতে উৎসাহিত করা যাইতে পারে।

বিশেষ উপলক্ষে গৃহসজ্জা ইত্যাদির জন্য নানারকম

আলপনা-আঁকার রীতি গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। শিশুরা সেই রকম আলপনা-আঁকা অভ্যাস করিতে পারে।

বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ঘর-বাড়ী, বিদ্যালয়গৃহ প্রভৃতি ফুল-পাতা ও নানা রঙীন জিনিষ দিয়া সাজান শিশুর—সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে গণ্য ও ইহাতে সে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে এবং ইহাতে তাহার সৌন্দর্য জ্ঞান ও সৌন্দর্য তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে। সুতরাং, এসকল কাজে ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে।

হস্তশিল্প ঃ হস্তশিল্প মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা আজ সর্বজনানুমোদিত। কিন্তু আমাদের দেশে আজও শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তশিল্পের যথাযথ গুরুত্ব স্বীকৃত হয় নাই। আশা করা যায়, নবপ্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমশ ইহার গুরুত্ব যথেষ্টভাবে স্বীকৃত হইবে এবং হস্তশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে যথাস্থান লাভ করিবে।

বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেষ্টালট্‌সি সর্বপ্রথম শিশুর মানসিক বিকাশের সাহায্যের জন্য শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। ফ্রোয়েবেল হাত ও চোখের ব্যবহারের দক্ষতা লাভের জন্য কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে হস্তশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশের বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক কোন হস্তশিল্পকে ভিত্তি করিয়াই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে।

সর্বত্র একই শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নয়। কোথায়

কোন্ শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে তাহা স্থানীয় অবস্থা, কাঁচা মালের সুলভতা ইত্যাদি কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

সাধারণত হাতের কাজের মধ্যে সূতাকাটা, কাপড়-বোনা, কাগজ-তৈরী, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, মাটির কাজ বা স্থানীয় কোন কুটীর শিল্পকে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দেওয়া যায়।

"প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় হাতের কাজ বলে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, শিশুর স্বাভাবিক পরিপুষ্টি, তার দৈহিক সামর্থ্য, তার আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতের কাজে শুধু হাতের নয়, তার মধ্যে সমগ্র দেহ ও মনের ক্রমবৃদ্ধির যাতে সুযোগ থাকে সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজের মধ্যে যদি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং শিশু যদি নিজে সেই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়, তবে তা তার চিন্তাশক্তির বিকাশের সহায়তা করবে।"

কাজের মধ্য দিয়া নিয়মানুবর্তিতা. অধ্যবসায়, ধৈর্য ও যৌথ দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুনের সম্যক বিকাশ হয়। তা ছাড়া, হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিলে যে শুধু একটি প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা হয় তাহা নয়—ছাত্রের মানসিক বিকাশের পথও অনেকখানি প্রশস্ত হয়।

আলপনা-আঁকার রীতি গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত আছে। শিশুরা সেই রকম আলপনা-আঁকা অভ্যাস করিতে পারে।

বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ঘর-বাড়ী, বিদ্যালয়গৃহ প্রভৃতি ফুল-পাতা ও নানা রঙীন জিনিষ দিয়া সাজান শিশুর—সৃজনাত্মক কাজের মধ্যে গণ্য ও ইহাতে সে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করে এবং ইহাতে তাহার সৌন্দর্য জ্ঞান ও সৌন্দর্য তৃষ্ণা বৃদ্ধি করে। সুতরাং, এসকল কাজে ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করা যাইতে পারে।

হস্তশিল্প ঃ হস্তশিল্প মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা আজ সর্ব-জনানুমোদিত। কিন্তু আমাদের দেশে আজও শিক্ষা ব্যবস্থায় হস্তশিল্পের যথাযথ গুরুত্ব স্বীকৃত হয় নাই। আশা করা যায়, নবপ্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমশ ইহার গুরুত্ব যথেষ্টভাবে স্বীকৃত হইবে এবং হস্তশিল্প শিক্ষাক্ষেত্রে যথাস্থান লাভ করিবে।

বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ পেষ্টালট্সি সর্বপ্রথম শিশুর মানসিক বিকাশের সাহায্যের জন্য শিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। ফ্রোয়েবেল হাত ও চোখের ব্যবহারের দক্ষতা লাভের জন্য কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে হস্তশিল্প শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশের বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থায় সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক কোন হস্তশিল্পকে ভিত্তি করিয়াই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে।

সর্বত্র একই শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নয়। কোথায়

কোন্ শিল্প শিক্ষা দিতে হইবে তাহা স্থানীয় অবস্থা, কাঁচা মালের সুলভতা ইত্যাদি কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

সাধারণত হাতের কাজের মধ্যে সূতাকাটা, কাপড়-বোনা, কাগজ-তৈরী, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, বাঁশ-বেতের কাজ, মাটির কাজ বা স্থানীয় কোন কুটীর শিল্পকে শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান দেওয়া যায়।

"প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় হাতের কাজ বলে যা কিছু শিক্ষা দেওয়া হোক না কেন, শিশুর স্বাভাবিক পরিপুষ্টি, তার দৈহিক সামর্থ্য, তার আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। হাতের কাজে শুধু হাতের নয়, তার মধ্যে সমগ্র দেহ ও মনের ক্রমবৃদ্ধির যাতে সুযোগ থাকে সে বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। কাজের মধ্যে যদি সমস্যার উদ্ভব হয় এবং শিশু যদি নিজে সেই সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়, তবে তা তার চিন্তাশক্তির বিকাশের সহায়তা করবে।"

কাজের মধ্য দিয়া নিয়মানুবর্তিতা. অধ্যবসায়, ধৈর্য ও যৌথ দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুনের সম্যক বিকাশ হয়। তা ছাড়া, হাতের কাজকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা দিলে যে শুধু একটি প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা হয় তাহা নয়—ছাত্রের মানসিক বিকাশের পথও অনেকখানি প্রশস্ত হয়।

॥ শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলা ॥

"শিশুর শরীর গঠনের জন্য সুখাদ্যের যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন উপযুক্ত ব্যায়ামের। ব্যায়াম বলতে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষম পরিচালনা বুঝায়। মানব-দেহের মাংস-পেশীগুলির যথোচিত বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক পুষ্টির জন্য তাদের পরিচালনা একান্ত দরকার। কোন মাংসপেশী যদি সঞ্চালিত না হয় তার পুষ্টি ও বিকাশ ঘটে না। আবার কোনটির অধিক সঞ্চালন ঘটলে তার অপরিমিত পুষ্টি শরীরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সুতরাং ব্যায়াম বলতে প্রতি অঙ্গের সুষম সঞ্চালন বুঝায়। এই সুষম সঞ্চালনের মধ্যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে এবং শিশুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই নিজেদের চলা-ফেরার মধ্যে এই ছন্দোময় অঙ্গসঞ্চালন-ক্রিয়ায় আসক্ত থাকে।"

"এই স্বাভাবিক ছন্দকে অব্যাহত রেখে শিশুদের জন্য এমন কোন ব্যায়াম-কৌশল নির্বাচিত করতে হবে যা শিশু প্রবৃত্তির পরিপূরক হবে, তার পক্ষে ভার স্বরূপ হবে না।"

"খেলাধূলা ও অঙ্গচালনার নির্বাচন ও পরিবেশ এমন হবে যেন দৈহিক পুষ্টি ও বিকাশের সংগে সংগে শিশুর শক্তি, সাহস ও কর্মক্ষমতা বাড়ে, তার শারীরিক গঠনভঙ্গী সুন্দর ও সুঠাম হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্ষিপ্রতা জন্মায় ও জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়, এর সংগে তার সামাজিক কর্তব্যবোধ, সহযোগিতামূলক

মনোভাব, দেশাত্মবোধ, নেতৃত্ব ক্ষমতা, জয়-পরাজয়ে খেলোয়াড় জনোচিত অনুত্তেজিত মনোভাব, আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সাধুতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণগুলির বিকাশসাধনের দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে হইবে। * * তা ছাড়া আট থেকে দশ বৎসরের শিশুদের জন্য এমন কতগুলি খেলা ব্যবস্থা করা চলে যাহাতে শিশুর দৈহিক ব্যায়ামের সংগে সংগে শ্রবণক্ষমতা, আচরণ করবার ক্ষমতা, ও অনুকরণ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যথা—

(ক) শিকার করার অনুরূপ খেলা—দৌড়ান, পশ্চাদ্ধাবন, বন্দীকরা, পলায়ন।

(খ) নিক্ষেপকরা ও ধরা, কোনও বস্তু একদলের নিকট হ'তে অপরে লুফে নেবে—"রুমাল-চুরির" মত খেলার ব্যবস্থা রাখা যায়।

(গ) বিভিন্ন জীবজন্তুর চালচলনের অনুকরণমূলক ব্যায়াম।

(ঘ) দৌড় ও ঝাঁপ সংযুক্ত খেলাধূলা।

'ড্রিল'—এই বয়সের ছোট ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত নয়, কারণ ড্রিলের মধ্যে আনন্দ, কল্পনাশক্তি, অনুকরণ ও অভিনয়-শক্তির সার্থকতা ঘটে না ও শিশুকে অত্যধিক শৃঙ্খলায় ভারাক্রান্ত করে।"

দলবদ্ধ প্রতিযোগিতামূলক খেলার দোষগুণ দুই-ই আছে। ইহাতে দশে মিলিয়া, দশের গৌরবের জন্য কাজ করার মনোভাব ও অভ্যাস হয়, শিশুরা দলকে ব্যক্তির উর্ধে

ভাবিতে শেখে। অপরপক্ষে, এ জাতীয় খেলায় প্রতিযোগিতা অবাঞ্ছনীয় রূপ গ্রহণ করিতে পারে, দলের স্বার্থের জন্য ন্যায় ও সত্য অবহেলিত হইতে পারে। তাই এ জাতীয় খেলা প্রবর্তন ও পরিচালনায় এবং দল গঠনে সতর্কতা প্রয়োজন।

শিবির স্থাপন, বেড়াইতে-যাওয়া, মেলা, মজলিস প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারাও শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলার উদ্দেশ্যে সাধিত হইতে পারে।

বিত্তালয়-ব্যবস্থাপনা

শিশুশিক্ষার পাঠ্যক্রম কর্ম ও জীবনকেন্দ্রী হইবেঃ ছোট ছোট শিশুরা লেখাপড়ার প্রয়োজন অনুভব করে না। তাহারা বড়জোড় অনুকরণ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বড়দের দেখাদেখি বই পড়ার অভিনয় করিতে চায়। কিন্তু অক্ষর চিনিয়া, বানান করিয়া, বই-পড়া-শেখার যে প্রচেষ্টা দরকার তাহা ঐ ভাবে অনুকরণ বৃত্তির তাগিদে আসে না। সুতরাং মিষ্টি কথা বলিয়া—অথবা ধমক দিয়া তাহাদিগকে ঐ কাজে ব্রতী করিতে হয়। এই ভাবে শিশুকে লেখাপড়া শেখায় নিযুক্ত হয়ত করা যায় কিন্তু অনুপ্রাণিত করা যায় না। আনন্দ পায় না বলিয়া এইরূপ শিক্ষায় শিশু যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারে না। তাই শিশুকে বর্ণবোধ শিক্ষা দেওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শুধু তাই নয়—শিশুর ইচ্ছা শক্তিকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া 'ভুলিয়ে ভালিয়ে' অথবা ধমক দিয়া এইভাবে লেখাপড়া শেখান মারফৎ আমরা শিশুর ইচ্ছা শক্তিকে খর্ব করি, তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা প্রদান করি। আর এক দিক হইতে বিচার করিলে, শিক্ষা বলিতে যে সর্বাংগীন বিকাশ বুঝায় তাহার প্রতি অবহেলাই প্রকাশ করা হয়। তাই বর্তমানে শিশুকে বর্ণবোধ দিবার জন্যে পূর্ব-পদ্ধতি ত্যাগ করা হইয়াছে ও শিশু শিক্ষায় সম্পূর্ণ নূতন ধারা প্রবর্তন করা হইয়াছে, পৃথিবীর সব প্রগতিশীল দেশেই।

আমাদের দেশের শিশু শিক্ষাতেও তাহার প্রচলন করা বাঞ্ছনীয়। এখানে উক্ত নূতন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

শিশুরা কাজ ও খেলা ভালবাসে। অবশ্য কাজের যে উদ্দেশ্যমূলক দিকটা আছে তাহা শিশুকে তেমন আকর্ষণ করে না, তবে বড়দের কোন কাজ তাহারা স্বভাবতই অনুকরণ করিতে চায় এবং তাহাদের কাজটা যদি আদৃত হয় তবে তাহারা আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দ অনুভব করে। আর খেলার প্রতি শিশুর আকর্ষন অত্যন্ত স্বাভাবিক। সুতরাং ছোট শিশুকে কাজ ও খেলার মাধ্যমে যদি শিক্ষা দিতে পারা যায়, তবে তাহারা খুব আনন্দের সংগে শিক্ষালাভ করে—শিক্ষার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ জন্মে। এখন আমাদিগকে জানিতে হইবে কী ভাবে কাজ ও খেলার মারফৎ তাহাদিগকে বর্ণবোধ, ভাষাজ্ঞান ও গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া যায় ও তাহার ব্যক্তিত্বের অন্যান্য দিকের বিকাশ সাধন করা যায়।

কর্ম ও জীবন কেন্দ্রী শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ শিক্ষকের প্রথম কাজ হইবে শিশুদের একজন বন্ধু হওয়া, যেন শিশুরা তাহাদের নিজেদের একজনের মতই অসংকোচে তাঁহাকে গ্রহণ করে। তারপর শিক্ষক তাহাদের সংগে আলাপ-আলোচনা করিয়া একটা কাজ বা খেলা ঠিক করিয়া নিবেন। এরপর তাহার কাজ হইবে ঐ কাজটাকে এমন ভাবে পরিচালনা করা যাহাতে তাহার মধ্যে হইতে শিশুরা বিভিন্ন বিষয়ের

জ্ঞানলাভ করিবে ও তাহাদের চরিত্রের বিভিন্নমুখী বিকাশ ঘটিবে।

মাটির পুতুল প্রভৃতি তৈরী ছোটদের শিক্ষার মাধ্যম হইবার উপযোগী একটা ভাল কাজ। মাটির পুতুল অথবা মাটির পুতুল তৈরী করা দেখিলে শিশুরা সহজেই মাটির পুতুল তৈরী করার প্রস্তাব গ্রহণ করিবে। তখন শিক্ষক তাহাদের সংগে আলাপ-আলোচনা করিয়া মাটির পুতুল তৈরী করার একটা সহজ পরিকল্পনা নিতে পারিবেন। পরিকল্পনাটা হইবে তাহাদের মত—অর্থাৎ খুব বড় কিছু ব্যাপার নয়। "মাটি দিয়া খুব সুন্দর সুন্দর পুতুল তৈরী করা যায়। আমরা মাটির পুতুল তৈরি করিব। মাঠ হইতে ভাল মাটি নিয়া আসিব। মাটি শুকাইয়া ঝুড়া করিয়া লইব। ঢিল-পাটকেল বাছিয়া নিব। তারপরে মাটি জল দিয়া ভিজাইয়া কাদা তৈরী করিব।

বেশী জল দিব না তাহা হইলে মাটি নরম হইয়া যাইবে। ঐ কাদা দিয়া পুতুল তৈরী করিয়া শুকাইয়া নিব। তারপর আগুনে পোড়াইয়া লইয়া রঙ্ দিব।" উপরের পরিকল্পনাটি মৌখিকভাবে নেওয়া হইবে। কিন্তু কাজটা একদিনে হইবে না। সময় লাগিবে—সুতরাং কাজটার কথা লিখিয়া রাখা যে ভাল তাহা বুঝাইলে সহজেই শিশুরা বুঝিবে। তাহারা খাতায় এই কথা কয়টি লিখিয়া নিতে পারিবে। "আজ হইতে আমরা মাটির পুতুল তৈয়ারী করিব," বা

বা "আমরা মাটির পুতুল বানাইব।" এই বাক্যটা পড়া-লেখার মধ্য দিয়াই তাহারা বাক্য-ক্রমিক পদ্ধতিতে লিখিতে-পড়িতে শিখিবে। তারপর তাহারা ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া মাটি আনিতে যাইতে পারে। এই উপলক্ষে শিক্ষক তাহাদিগকে মাঠে বেড়াইয়া লইয়া আসিলেন—সেখানকার কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইলেন ও কথা বার্তার মধ্য দিয়া কিছু দেখিবার ও শিখিবার সুযোগ দিতে পারিলেন। যাওয়া, মাটি কাটা, বহন-করা ও লইয়া-আসার সময়ে তিনি শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইলেন ও শৃঙ্খলা শিখাইলেন। মাটি বহনের সময় পর্যায়ক্রমে মাটি বহনের শিক্ষা দিতে পারেন। এই ভাবে নানা কার্যকর অভিজ্ঞতার সুযোগ তিনি শিশুদিগকে দিতে পারিবেন। মাটি কোন্ স্থানে রাখিলে সহজে শুকাইবে এই প্রসংগে সূর্যের আকাশ প্রদক্ষিণ ব্যাপারেও শিশুকে অবহিত করার সুযোগ পাইবেন। তারপর শিশুরা হাত-পা ধুইয়া আসিবে—এর মধ্যে তাহারা পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা পাইবে। মাটি নির্বাচন করিবার সময় বিভিন্ন মাটির মধ্যে কীরূপ ধরনের মাটি পুতুল-গড়ার উপযোগী তাহা শিশুরা কার্যকরী ভাবে শিখিবে। শ্রেণীতে আসিয়া শিক্ষক কিছুটা হিসাব-নিকাশের সুযোগ দিতে পারিবেন যেমন—আমরা ১৬ জন ৪ জনের ৪টি দলে ভাগ হইয়াছিলাম। ৪ জনে দুই ঝুড়ি করিয়া ৮ ঝুড়ি মাটি আনিয়াছি। —খাতায় শিশুদের মত করিয়া বিবরন রাখা

যায়—"আমরা আজ মাটি আনিয়াছি। মাটি শুকাইতে দিয়াছি।"

এইভাবে শিশুদিগকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যায়। ১ম ও ২য় শ্রেণীতে ছবি-আঁকা, মাটির পুতুল তৈরী, কাগজের ফুল-কাটা, ছোট বাগানের গাছের পরিচর্যা করা, দোকান-দোকান খেলা, পুতুলের সংসার-গড়া, ছড়া-বলা ও নৃত্য সহ আবৃত্তি প্রভৃতি আনন্দ দায়ক ছোট ছোট কাজ-কর্ম ও কল্পনাশ্রয়ী খেলধূলার মাধ্যমেই কথা-বলা, লেখাপড়া-শেখা, ভাব প্রকাশ করা, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া ভাল।

সময়-পত্রিকা রচনাঃ বিদ্যালয়ের সময় পত্রিকা রচনা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রথম দুই শ্রেণীতে কী ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি। তাহাতে দেখা যাইবে যে এই দুই শ্রেণীতে শিশুরা বিষয়ানুযায়ী শিখিবে না—কাজ-কর্ম, খেলাধুলার মাধ্যমেই বিভিন্ন বিষয় মিশ্রিত ভাবে শিখিবে। এজন্য এই দুই শ্রেণীতে বিষয় অনুসারে সময়-পত্রিকা রচনা করা হইবে না। কাজ অনুযায়ী হইবে—যথা, (১) শ্রেণী-গৃহ পরিষ্কার করা (২) প্রার্থনা বা সমবেত গান করা (৩) বাগানের কাজ (৪) পুতুল-গড়া (৫) গল্প-বলা (৬) ছুটাছুটির খেলা (৭) গান-করা (৮) ছবি-আঁকা (৯) গল্পের বই পড়া (১০) অভিনয় করা (১১) ভ্রমণ প্রভৃতি

তৃতীয় শ্রেণী হইতে ধীরে ধীরে বিষয়ানুযায়ী সময় পত্রিকা প্রচলন করা যাইতে পারেঃ যথা, (১) সাহিত্য (২) গণিত (৩) ইতিহাসের গল্প (৪) ভূগোলের গল্প—এর সংগে (ক) বাগানের কাজ (খ) ছবি-আঁকা (গ) শিল্পকাজ (ঘ) অভিনয় প্রভৃতি কাজও রাখিতে হইবে। সময় পত্রিকা রচনার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্য প্রভৃতি যে বিষয়গুলির জন্য অধিক মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হয় সেইগুলি প্রথমের দিকে রাখা ভাল এবং এই রকম কোন কঠিন বিষয় পড়ার পর শিশুদের মানসিক ক্লান্তি অপনোদনের জন্য আনন্দদায়ক কার্যক্রম রাখা প্রয়োজন। খেলা, গান, চিত্রাংকন, ভ্রমণ প্রভৃতি কার্যক্রম দ্বারা মানসিক ক্লান্তি দূর করা যায়। প্রথম দুই শ্রেণীতে প্রত্যহ ৪ ঘণ্টা, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে ৪॥০ ঘণ্টা ও ও পঞ্চম শ্রেণীতে ৫ ঘণ্টা শ্রেণী-কার্য চলা উচিৎ। শেষোক্ত তিনটি শ্রেণীতে ২ ঘণ্টা বৌদ্ধিক বিষয় পাঠনা চলিবে ও অবশিষ্ট সময় কাজকর্ম, খেলা-ধূলা ও তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা বা আলোচনা চলিবে। প্রতি শ্রেণীতেই শরীর-চর্চার জন্য সপ্তাহে দুই তিন দিন করিয়া ব্যবস্থা রাখা উচিৎ। বড়দের (৩য় হইতে পঞ্চম শ্রেণী) জন্য খেলা থাকিবে, তদুপরি অংগ-সঞ্চালন ব্যবস্থাও রাখা বিধেয়। ইহা সাধারণত দিনের কাজের শেষের দিকে রাখা ভাল। শ্রেণী বসার পূর্বে সামান্য অংগ-সঞ্চালন রাখাও মন্দ নয়। দিনের কাজের মধ্যভাগে অন্ততঃ ১৫ মিনিট বিশ্রাম ব্যবস্থা রাখা বিধেয়।

পাঠ্যক্রমের পরিপূরক কাজ কর্মঃ আমাদের দেশের সাধারণ লোকের ধারণা যে বিদ্যালয়ের প্রথম কার্য হইতেছে শিশুকে লেখাপড়া, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের বৌদ্ধিক জ্ঞানলাভে সাহায্য করা। কিন্তু মাত্র বৌদ্ধিক বিকাশ হইলেই শিশু যে ঠিকমত মানুষ হইয়াছে এ ধারনা ঠিক নয় এবং যদি শিশুর শরীর ও কর্মক্ষমতার যথোপযুক্ত বিকাশ না ঘটে তাহা হইলে তাহার বৌদ্ধিক অগ্রগতিও আশানুযায়ী ঘটে না। এই জন্য শিশুর শরীর, আচার-ব্যবহার, কর্মক্ষমতা ও মন যেন ঠিকমত বিকশিত হইবার সুযোগ পায়—এইরূপ কার্যক্রম বিদ্যালয়ে রাখার ব্যবস্থা অনেক দিন হইতেই কিছু কিছু হইয়াছে। —এইজন্য শরীর চর্চা, খেলাধূলা, চিত্রাংকন, বিতর্কসভা, সাহিত্য-সভা প্রভৃতির ব্যবস্থা অনেক বিদ্যালয়ে রাখা হয়। ব্রতচারী, "স্কাউটিং" প্রভৃতির ব্যবস্থাও অনেক বিদ্যালয়ে থাকে। কিন্তু পূর্বে এইগুলিকে উদ্বৃত্ত কার্যক্রম হিসাবেই দেখা হইত ও সকল শিশু এইগুলিতে যোগ দিত না। ইহার কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে ঐ গুলির উপযোগিতা ঠিক মত উপলব্ধি করা হয় নাই। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ ঐ গুলির উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—তাই বর্তমানে ঐ গুলিকে আর উদ্বৃত্ত কার্যক্রম হিসাবে দেখা হয় না—বৌদ্ধিক বিষয়ের মতই গুরুত্ব-যুক্ত কার্যক্রম হিসাবে ধরা হয়। অনেকে মনে করেন ঐ সব কার্যক্রম সম্ভবত উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নহে। কিন্তু

ইহা ভুল—বরং ছোটদের বিকাশ-শীলতাকে সর্বতোমুখী রাখার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়েই ঐ গুলির উপযোগিতা সর্বাধিক।

চড়ুইভাতি, ভ্রমণ, সাহিত্য-সভা, ছোটখাট অভিনয়, সেবাদল-গঠন, অলোচনা-সভা প্রভৃতি পরিচালনার জন্য বিশেষ খরচের কোন প্রয়োজন হয় না। অল্প খরচে অনেক রকম খেলাধূলার ব্যবস্থাও করা যায়। ঐ গুলির মধ্য দিয়া শিশুদের শৃংখলা, স্বরুচিবোধ, সংগঠন ক্ষমতা, উপস্থিত বুদ্ধি ভাষাজ্ঞান প্রভৃতির বিকাশ ঘটে ও তাহারা তাহাদের বৌদ্ধিক জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ পায়। ঐ সমস্ত কার্যক্রমকে রূপ-দানের ক্ষেত্রে শিশুদের ও অভিভাবকদের সহযোগিতা আহ্বান করিলে সাড়া পাওয়া যায়। গ্রাম্য উৎসবাদি প্রতিপালনের সময় গ্রাম্য শিল্পীগণের সাহায্য লইলে ঐ সব শিল্পীগণ সানন্দে তাহা প্রদান করে এবং ঐ শিল্পীগণও শিক্ষার সংস্পর্শে আসে। এইভাবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গ্রাম্য সমাজের সহিত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিবার প্রয়োজন আছে। ইহা শিশুগণকে গ্রাম্য সমাজের দোষগুণ বুঝিতে ও উন্নত সমাজের উপযোগী নাগরিক রূপে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে।

শৃংখলা: বিদ্যালয়ের শৃংখলা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পোষণ করা ও তদনুযায়ী বিদ্যালয়কে ঠিকভাবে পরিচালনা করা একটি জরুরী ব্যাপার। বিদ্যালয়ে শৃংখলা না থাকিলে শ্রেণী কার্য অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং বিদ্যালয়ে শৃংখলার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শিশুরা ভয়ে আড়ষ্ট থাকিলেই যে

সত্যকার শৃংখলা স্থাপিত হইল ইহা কদাচ ঠিক নয়। শিশুদের মনে স্ফূর্তি না থাকিলে তাহারা মনোযোগী হইতে পারে না—কাজেই বৌদ্ধিক বিষয়ে পাঠদান ব্যর্থই হয়। সুতরাং ভয়ের রাজত্ব দ্বারা যে শৃংখলা আনা যায় তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। আবার এইভাবে যে শৃংখলা আনা গেল তাহার বিরুদ্ধে শিশুর মন বিরূপ থাকে ও ঐ বিরূপতা শৃংখলার প্রতিই শিশুকে বিরূপ করে। ফলে ঐ শিশু যেখানে স্বাধীনভাবে আচরণের সুযোগ পায় সেখানে শৃংখলা মানে না। দৈহিক শাস্তিদান তো আরও খারাপ। ইহাতে শিশুর মনে জিঘাংসা বৃত্তির বৃদ্ধি ঘটায়। শিশুও অপরকে দৈহিক পীড়ন করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। যখন শিশু শৃংখলার উদ্দেশ্য বুঝে সে নিজ প্রেরণায় শৃংখলা মানে বা শৃংখলা স্থাপনে সক্রিয় অংশ নেয়। তখন যে শৃংখলা স্থাপিত হয় তাহাই আদর্শ শৃংখলা। এইরকম শৃংখলা আনার জন্য প্রথম সর্ত হইবে শিশুর শ্রেণী কার্যের প্রতি সত্যকার আগ্রহ সৃষ্টি করা। ঐ আগ্রহ সৃষ্টি হইলে শিশুকে বুঝিতে সুযোগ দিতে হইবে যে শ্রেণীর বিভিন্ন কার্য ভাল পরিচালনের জন্য শৃংখলার একান্ত প্রয়োজন। তারপর যদি শিশুদের দ্বারাই শৃংখলার নিয়মগুলি নির্ণয় করা হয় ও উহা ঠিকমত রক্ষা করার ব্যাপারে শিশুদের উপরই অধিক দায়িত্ব দেওয়া হয়—শৃংখলা ভাংগিবার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের দায়িত্বও শিশুদিগকে দেওয়া হয় তাহা হইলে যে শৃংখলা স্থাপিত

হইবে তাহাই আদর্শ শৃংখলা। এই শৃংখলার সহিত শিশুর স্বাধীনতা ও শিশুগণতন্ত্রের বিরোধ থাকিবেনা। বর্তমানে উপর হইতে চাপানো শৃংখলায় অভ্যস্থ শিশু দাসমনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়। কিন্তু উপরে বর্ণিত শৃংখলায় অভ্যস্থ শিশু গণতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নাগরিকের মনোবৃত্তি সম্পন্ন হইবে। যাহাতে শিশুরা শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ঠিকমত বুঝিতে পারে তজ্জন্য শিশুরা যে সব কাজকর্ম করিতে আগ্রহী হয় সে সব কাজকর্মের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে থাকা ভাল। তাহা হইলে ঐ কাজকর্মগুলি ঠিকমত ও ভালমত করার আগ্রহেই তাহারা শৃংখলার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে ও শৃংখলা রাখিতে আগ্রহী হইবে। কাগজ-কাটার জন্য কাঁচি-ছুরির প্রয়োজন। ৪টি কাঁচি দিয়া ১৬ জন কাজ করিবে—প্রতি ৪জনে একটি কাঁচি নিবে ও কাহারও কাজ হইয়া গেলেই সে রাখিয়া দিবে, আর একজন নিবে, কাড়াকাড়ি করিবে না—পর্যায় মানিয়া চলিবে। এই নিয়মগুলি পালন করার পিছনে যে যুক্তি, যে সুবিধা আছে তাহা শিশুরা বেশ সহজেই বুঝিবে। তখন তাহাদের নির্ধারিত একজনকে ঐ নিয়মগুলি পালিত হইতেছে কিনা দেখার ভার দিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ঐ কাজের শৃংখলা স্থাপন করা হইবে। এইভাবে শৃংখলায় অভ্যস্থ হইলে শিশুরা সহজে বৌদ্ধিক শ্রেণীতেও শৃংখলা স্থাপনের প্রয়োজন বুঝিবে। শৃংখলা-ভংগের ত্রুটির সংশোধন করাও শিশু-নির্বাচিত বিচার-সভার হাতে দেওয়া ভাল—অবশ্য

বিচারে যেন কঠোর শাস্তি দেওয়া না হয় তাহার জন্য শিক্ষক প্রভাব সৃষ্টি করিবেন।

প্রতিযোগিতার স্থানে সহযোগিতা ঃ কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা সুরু করিলে শুধু উচ্চস্তরের শৃংখলা বোধ স্থাপিত হয় না—পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোবৃত্তি ও অভ্যাস গড়িয়া উঠে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার একটা মস্তবড় ত্রুটিই এই যে ইহাতে বড়বেশী প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়—এবং তার ফলে সহযোগিতার মনোভাব ধ্বংস হয়। প্রথম হইবার সম্ভাবনা যাহার আছে সে শুধু নিজেই ভাল পড়াশুনা করিতে চায় তাহা নয়, সে চায় যেন অন্যান্য ভাল ছাত্রের পড়াশুনা ভাল না হয়। পড়াশুনার ব্যাপারে সে সহপাঠীদের সাহায্য করিতে চায় না। ইহা যে কত ক্ষুদ্রতা তা আমরা সহজেই বুঝি। তবু আমাদের শিক্ষার ধরনটাই এমন যে আমরা এই ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করি না। কারণ উচ্চস্থান লাভ করিতে না পারিলে প্রশংসা মেলে না, ভাল চাকুরী মেলে না। কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় এইরূপ প্রতিযোগিতা থাকে না। কারণ পাঁচজনে মিলিয়া-মিশিয়া না করিলে কাজ ও খেলার ক্ষেত্রে সাফল্য আসে না। অথচ স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার সুযোগ যে কর্মকেন্দ্রী বিদ্যালয়ে নাই তাহা নহে। সকলের চেয়ে বেশী শৃংখলানিষ্ঠ, সেবা-মনোভাবসম্পন্ন ও কার্য্যোদমশীল হইবার আকাংখা ইহাতেও জন্মে ও তাহা পুরণের সুযোগও থাকে। সমাজকে উন্নত করার ক্ষেত্রে এইরূপ সহযোগিতা-

মূলক প্রতিযোগিতার মনোভাব যে একান্ত প্রয়োজন তা আমরা সবাই বুঝি—সুতরাং চলতি শিক্ষার প্রতিযোগিতা-সর্বস্বতার পরিবর্তে এই মনোভাব যে সমাজের প্রগতির সূচনা করিবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। আমাদের শ্রেণীকে সবচেয়ে পরিষ্কার রাখিব—আমাদের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসটি নিখুঁত ভাবে পালন করিব—খেলাধূলায় আমরা সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ অথচ সফল বলিয়া নাম করিব—এইরূপ মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হইলে একাধারে সহযোগিতার অভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব দ্বারা উদ্দীপনা লাভ ঘটে। আমরা শ্রেণীতে কেউ কোনও বিষয়ে অকৃতকার্য হইব না—সমস্তশ্রেণী পড়াশুনায় সুনাম অর্জন করিবে—এই মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারিলে অগ্রসর শিশুরা পিছিয়ে-পড়া শিশুদিগকে সাহায্য করে—ফলে তাহারাও আর পিছাইয়া থাকে না—অথচ প্রতিযোগিতার ক্ষুদ্রতা দূর হয়। অগ্রসর শিশুরাও নূতন পথে তাহাদের উদ্যমকে ব্যবহার করিয়া অধিকতর ব্যুৎপত্তিলাভের সুযোগ পায়। এইরূপ সমষ্টিবোধযুক্ত প্রতিযোগিতাকে বলা হয় "Socialistic Competition" এবং সমাজের প্রগতির পথে ইহার অবদান খুবই বেশী। কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিদ্যালয় পরিচালনের দ্বারাই ইহা সম্ভব।

অভিভাবকের সহযোগিতা ঃ বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। যে অভিভাবকগণ তাঁহাদের শিশুদিগকে শিক্ষার

জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান না করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহারা উৎসাহ প্রদর্শন করেন না—ফলে বিদ্যালয়ের উন্নতি ব্যাহত হয়। তাই শিক্ষাবিদগণ যদি কোনও নূতন শিক্ষানীতি বা পদ্ধতির সন্ধান পান তাহা হইলেই তাঁহারা বিদ্যালয়ে উহাকে রূপায়িত করিতে পারেন না, যতক্ষণ না অভিভাবকগণ তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করেন। অধিকাংশ অভিভাবক শিক্ষাজগতের নূতন নূতন চিন্তার সহিত সংযোগ রাখেন না—তাঁহারা নিজেদের বাল্যকালে যে নীতি ও পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহার প্রতিই আনুগত্য রাখেন এবং কোনও নূতন পদ্ধতির প্রতি একটা সন্দেহ ও বিরূপতার ভাব পোষণ করেন। তাই শিক্ষা পদ্ধতির কোন পরিবর্তন আনিতে হইলে আগে অভিভাবক-গণকে ঐ পরিবর্তনের যৌক্তিকতা বুঝিবার সুযোগ দিতে হইবে যেন তাঁহারা বিরূপতা ত্যাগ করিয়া সংস্কারের সমর্থক হন। সুতরাং শিক্ষকগণের সংগে অভিভাবকগণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া, শিশুরাতো বিদ্যালয়ে মাত্র ৫ ঘণ্টা থাকিবে—তাও সব দিন নয়। বাকী সময় তাহারা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সুতরাং আমরা যদি মামুলী লেখাপড়ার কথা না ভাবিয়া শিশুর সর্বাংগীন বিকাশের কথা ভাবি তাহা হইলে শিশুর বিদ্যালয়ের জীবনের সহায়ক হিসাবেই তাহার বাড়ীর জীবনও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। বিদ্যালয়ে সহযোগিতা, কর্মনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা

শিখিবে আর বাড়ীতে ঝগড়া করিবে, মিথ্যা বলিবে ও কর্মের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইবে ইহাতে সুফল হইতে পারে না—তাই ব্যাপক আদর্শ-সম্পন্ন শিক্ষানীতি জ্ঞাপনের জন্য অভিভাবকদের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। যদি শিক্ষকগণ অভিভাবকগণের সংগে দেখাসাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদের শিশুর মংগল-অমংগলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন তবে তাঁহারা সহজেই অভিভাবকগণের হৃদয় জয় করিতে পারিবেন। তারপর যদি তাঁহারা শিশুদের খেলাধূলা, উৎসবানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অভিভাবকগণকে আমন্ত্রণ করেন—মাসে মাসে বা বৎসরে ৩।৪ বার অভিভাবক-সম্মেলন ডাকিয়া বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতির জন্য তাঁহাদের সহযোগিতা চান—বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখান ও প্রতিটি কাজ কর্মের তাৎপর্য বুঝান, সুবিধা-অসুবিধার কথা বলেন, বন্ধুভাবে নানা কাজকর্মের সাহায্য চান, তবে অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী হইয়া উঠিবেন, ও বর্তমান শিক্ষাধারার তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা প্রথম দিকে নূতন শিক্ষাধারার প্রতি বিরূপ ছিলেন তাঁহারাও বিরূপতা ত্যাগ করিয়া উৎসাহী সমর্থক হইবেন। এইভাবে অভিভাবকগণ যখন নূতন শিক্ষা ব্যাপারে সব জানিবেন ও উৎসাহী হইয়া উঠিবেন তখন বিদ্যালয় পরিচালনায় তাঁহাদের সহযোগিতা সহজেই পাওয়া যাইবে। বিদ্যালয়ের অগ্রগতির বিবরণ তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে। বিশেষ শিশুর কোন সমস্যা তাহার

অভিভাবকদিগের গোচরীভূত করিতে হইবে, এবং মাঝে মাঝে প্রদর্শনী ইত্যাদির সাহায্যে শিশুদের কাজকর্ম, খেলাধূলা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতে হইবে। নূতন শিক্ষানীতির একটা প্রধান উদ্দেশ্য শিশুকে সমাজ-চেতনা সম্পন্ন করা। এজন্য শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীগণ সহ সমাজের হিতকর কোনও না কোনও কাজে প্রায়ই ব্রতী হইবেন। এসব কাজেও অভিভাবকগণের সহযোগিতা আহ্বান করা উচিৎ। এমনকি এইরূপ কাজের পরিচালনা করার পূর্বে গ্রামবাসীদের সংগে আলোচনা করা ভাল। এর ফলে শুধু যে বিদ্যালয়ের প্রতি গ্রামবাসীর আগ্রহ বাড়িবে ও বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে তাহাই নয়—এইভাবে বিদ্যালয় সমাজশিক্ষার কাজেও প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে। বর্তমানে গ্রামবাসীগণ বেশী পরিমানে আত্মকেন্দ্রী। এইসব কাজে তাহাদের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন ঘটিবে—তাহারা সমাজকেন্দ্রী হইয়া উঠিবে। তাহাদের যে আত্মদম্ভ এতদিন কূপমণ্ডুকতার খাতে প্রবাহিত হইতেছিল, যে প্রতিযোগিতা বৃত্তি পরস্পরের প্রতি হিংসা ও কলহে ব্যয় হইতেছিল তাহা একটি গঠনাত্মকখাতে বহিবার সুযোগ পাইবে। সমাজের কল্যাণ সাধনে তাহারা তৎপর হইয়া উঠিবে। আর এইভাবে সমস্ত গ্রামের পরিবেশই যখন প্রগতিমুখী হইবে তখন শিশুকেও উন্নত ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করা সহজ হইবে—ফলে বিদ্যালয় কালক্রমে সমগ্র গ্রামের

প্রগতিকেন্দ্রে পরিণত হইবে। তবে শিক্ষককে শুধু শিশুপাঠ্য বিষয়গুলির জ্ঞান রাখিলেই চলিবে না তাহাদিগকে একটা উন্নত সমাজ-চিন্তার অধিকারী ও প্রগতিধর্মী হইতে হইবে, হইতে হইবে সমাজের আদর্শ নাগরিক।

এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিত্যালয়ঃ আমাদের দেশের প্রাথমিক বিত্যালয়-ব্যবস্থাপনার এক বিশেষ সমস্যা এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিত্যালয়। আমাদের গ্রামাঞ্চলে নির্দিষ্ট বয়সের প্রত্যেকটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগের ব্যবস্থা করিতে হইলে বহুগ্রামে একাধিক শিক্ষকের প্রাথমিক বিত্যালয় স্থাপন, ছাত্রসংখ্যা ও অর্থনৈতিক বিবেচনায়, সমর্থনযোগ্য হইবেনা। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সকলকে দিতে হইবে। কাজেই এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিত্যালয় আমাদের দেশে রাখিতে হইবে।

আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এক শিক্ষকের বিত্যালয় চলিয়া আসিতেছে। সংস্কৃত টোলে আজও একজন গুরু বিভিন্ন বিষয়ের ও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে আজও আমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, কানাডায় ও সুইডেনে এক শিক্ষকের বিত্যালয় চলিতেছে।

এক শিক্ষকের বিত্যালয়ের বিপক্ষে বিরূপ সমালোচনা থাকিলেও, আমাদের দেশ সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত এই যে একশিক্ষকের বিত্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ জাতীয়

বিদ্যালয় তুলিয়া দিলে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হইবে। তাই এগুলিকে তুলিয়া না দিয়া, উপযুক্ত পরীক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ ইত্যাদি দ্বারা এসকল বিদ্যালয়কে অধিকতর কার্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে। "Those who advocate the abolition or amalgamation or consolidation of single-teacher schools have failed to visualise their indispensable place in the frame work of the Indian educational system. * * The right approach to the problem is to mend these schools rather than to end them"—R. V. Parulekar : Literacy in India : Chap.—X.

এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহ এই যে (১) এ শ্রেণীর বিদ্যালয় সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইতে হইবে, (২) শিক্ষকদিগের স্বল্প বা দীর্ঘকালীন ছুটীর কালে অন্য শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে, (৩) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার পাঠ্যসূচীতে এ জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালনা বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইবে, (৪) বৎসরের প্রথমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্র ভর্তি শেষ করিতে হইবে এবং (৫) এ জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ তত্বাবধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

একক শিক্ষকের পাঠদানকার্য সহজ করিয়া তোলার জন্য এজাতীয় বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীকে মিলাইয়া নেওয়া যাইতে

পারে। আমেরিকায় পাঁচ-শ্রেণী বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পাঠদানের জন্য তিন শ্রেণী বিশিষ্ট করিয়া লওয়া হয়। ১ম শ্রেণী স্বতন্ত্রই থাকে। ২য় শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণী এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী একসংগে মিলাইয়া লওয়া হয়। যদি কোন বিদ্যালয় মাত্র চার শ্রেণী বিশিষ্ট হয় (আমাদের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও মাত্র চার শ্রেণীই আছে) তবে ১ম ও ২য় শ্রেণী এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী মিলাইয়া লওয়া হয়। সুইডেনে ৫ম শ্রেণীকে স্বতন্ত্র রাখিয়া ১ম ও ২য় শ্রেণী এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী মিলাইয়া লওয়া হয় এবং এক বৎসর পর পর নূতন ছাত্র ভর্তি করা হয়। এক বৎসর পর পর ৫ম শ্রেণী থাকে না। তাই কার্যত এক বৎসর দুই শ্রেণী ও পরের বৎসর তিন শ্রেণী থাকে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য ব্যবস্থা এই যে শ্রেণীসংখ্যা ঠিকই রাখিয়া বিভিন্ন শ্রেণীকে এক সংগে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ টাস্‌ম্যানিয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণীতে পঠন, বানান, অংক ও সূচীশিল্প সম্বন্ধে পৃথকভাবে পাঠদান করা হয়ঃ সমস্ত শ্রেণীতে একই সংগে শারীর শিক্ষা, সংগীত, ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ প্রকৃতি-বিজ্ঞান, অংকন ও হাতের কাজ দুই ভাগে শেখান হয়; ভাষা, কবিতা, ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যামিতি তিন ভাগে শেখান হয়।

এ ব্যবস্থার একটা কাঠামো শিক্ষাবিভাগ অনুসন্ধান ও

পরীক্ষালব্ধ তথ্যানুসারে প্রথম প্রনয়ন করিয়া দিবে। — পরে এজাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ অনুসারে ইহার প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যাইতে পারে।

তৃতীয় প্রযোজ্য পদ্ধতি সর্দার-পড়ুয়ার সাহায্যগ্রহণ (Monitorial System)। এ পদ্ধতি অতি প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় বিদ্যালয়েই প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে যে ভারতবর্ষ হইতে পাশ্চাত্য দেশ এ পদ্ধতি শিখিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়াতে এ পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং ইহাতে উৎসাহজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। এ পদ্ধতি প্রবর্তনে বাস্তবিক আমাদের দেশে পূর্ব প্রচলিত এক পদ্ধতির পুনঃ প্রবর্তন হইবে।

এ পদ্ধতিতে একক শিক্ষকের কার্যভার লাঘব হয়। বিদ্যালয়ের কাজ সহজ হয়। অপর দিকে সর্দার-পড়ুয়াও উপকৃত হয়। তাহার দিক হইতে এ পদ্ধতিকে "learning by teaching" বলা যায়। ছাত্রদের মধ্যে এইপ্রকার সহযোগিতায় পরস্পরের সংগে সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা ছাড়া নানা নৈতিক গুণের বিকাশও সম্ভব।

পূর্ব-বর্ণিত কার্য-সমস্যা-পদ্ধতি (Project Method) অবলম্বনেও এক শিক্ষকের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ সহজ হইয়া উঠিতে পারে।

গ্রাম সংগঠন ও সামাজিক শিক্ষা

কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমাদের বিদ্যালয় সমূহ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিল। যে সমাজের শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন থাকিত সে-সমাজের সংগেই বিদ্যালয়ের যোগাযোগ থাকিত না ঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও কার্যক্রমের সংগেও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের যোগাযোগ ছিল না। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা অস্বাভাবিক এবং ইহার ফলে শিক্ষা মারফত সমাজোন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। ছাত্রেরা দিনের কিছু অংশ বিদ্যালয়ে এক কৃত্রিম পরিবেশে এক কৃত্রিম শিক্ষা লাভ করিত মাত্র এবং তাহাদের বাস্তব জীবনেও সে শিক্ষা আশানুরূপ সুফল জনক হইত না।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশ এই যে বিদ্যালয়ের ও সেখানকার কার্যের সংগে সমাজের ও সমাজ-জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবে ঃ শিক্ষক হইবেন সমাজ-সেবক ও বিদ্যালয় হইবে প্রগতিধর্মী গ্রাম ও সমাজোন্নয়নকেন্দ্র এবং শিক্ষা সমগ্র সমাজ-জীবনকে উন্নত করিবে।

সমাজে বিদ্যালয়ের স্থান, গ্রাম ও সমাজ-সেবক হিসাবে ছাত্রদের অভিভাবকদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় শিক্ষক ও ছাত্রদের বিভিন্ন সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে এ পুস্তকের নানা স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ সকল আলোচনার মূল কথা এই যে শিক্ষক কখনই মনে করিবেন না যে ছাত্রদিগকে লেখা-পড়া আর

অংক-কষা শিখাইলেই তাঁহার কর্তব্য শেষ হইল : তাঁহার শিক্ষা ও কার্যদ্বারা সমগ্র সমাজে উন্নয়ন প্রচেষ্টা জাগরিত করিতে—শিক্ষার ফল সমগ্র সমাজ দেহে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। তাঁহার মারফত গ্রামে প্রয়োজনীয় নানা নূতন খবর আসিবে—গ্রামে সংঘবোধ উদ্বুদ্ধ হইবে।

গ্রামবাসীদের মনে সংঘবোধ জাগরিত করিতে পারিলে তৎপরবর্তী ধাপে গ্রামবাসীরা সমবায় মারফত অতি সহজে গ্রামের অভাব অভিযোগ দূর করিতে পারিবে। সমবায়ের নীতি আধুনিক পৃথিবীতে প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের গ্রামসমূহে অবশ্য ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে সমবায়-নীতি প্রবর্তন ও প্রয়োগ করিতে হইবে। সমবায় নীতির সফল প্রয়োগের জন্য পরার্থপরতা, ঐক্যবোধ ও সততার সংগে সংগে জনসাধারণের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তাও আছে। আমাদের দেশের সমবায়-নীতির অসাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ বোধ হয় জনসাধারণের অজ্ঞতা। আমাদের গ্রামে কৃষিতে প্রথম সমবায় প্রবর্তন করা যাইতে পারে। গ্রামবাসীরা যদি তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য সমবায়-সমিতির মারফত বিক্রয় করে এবং তাহাদের অত্যাবশ্যক বীজ, সার, লাংগল-বলদ সমবায়-সমিতির মারফত ক্রয় করে তবে তাহারা সহজেই সমবায়ের সুফল বুঝিবে ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সমবায়-নীতি প্রয়োগের জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিবে।

সমবায়ের মৌলিক নীতি সমূহ, আমাদের দরিদ্র গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাহাদের অত্যাবশ্যকতা, সমবায়-সমিতি গঠন ও ইহার কার্যাদি পরিচালনা সম্বন্ধে শিক্ষক জানিবেন ও গ্রামবাসীদের জানাইবেন।

আমাদের দেশে সরকারী পরিচালনাধীন এক সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা অনুসারে বহু গ্রামে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাম্যসমাজ ও গ্রামবাসীদের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূর করিয়া সামগ্রিকভাবে গ্রাম্যজীবনোন্নয়ন এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। (এ বিষয়ে এ পুস্তকের প্রথমদিকে আলোচনা করা হইয়াছে।) এ পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে গ্রামবাসীদের সক্রিয় সহযোগিতার উপর। শিক্ষক এ বিষয়ে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবেন এবং গ্রামবাসীদিগকে জানাইবেন। সরকারী উপদেশ-নির্দেশ অনুসারে, সরকারী অর্থ সাহায্যে, শুধু মাত্র আত্মচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইলে গ্রামবাসীগণ নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। শিক্ষক গ্রামবাসীদিগকে এই আত্মচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করিবেন।

সরকারী ও বেসরকারী যে-কোন গ্রামোন্নয়ন প্রচেষ্টার সংগে শিক্ষক নিজেকে যুক্ত করিবেন। আজ ধন-কৌলীন্যের যুগে দরিদ্র গ্রাম্য শিক্ষক তাঁহার পূর্বেকার সম্মানের আসনে নাই। কিন্তু সমাজে শিক্ষক তাঁহার পূর্ব-গৌরবের আসন পুনরুদ্ধার না করিতে পারিলে সমগ্র সমাজদেহে শিক্ষার সুফল বিস্তার লাভ করিবে না। শিক্ষকের স্বীয় চরিত্র,

কার্য ও সেবা দ্বারা সেই আসন পুনর্লাভ করিতে হইবে। শিক্ষককে তাঁহার বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতা লাভের সংগে সংগে নিজেকে গ্রামবাসীদের মংগলব্রতী বন্ধু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষক নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিবেন। উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ-করা আমাদের গ্রামবাসীদের স্বভাবসিদ্ধ।

আমাদের দেশের "শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি" এককালে শান্তিরই নীড় ছিল। আর গ্রাম্যজীবনের শান্তির মূলে ছিল গ্রামবাসীদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, পরস্পরের সহযোগিতা এবং সর্বোপরি সংহতি ও সংঘবোধ। আজ গ্রামগুলি অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য আর কুসংস্কারে ভরা। সংহতি ও সংঘবোধহীন গ্রাম্য জনসাধারণের এ বর্তমান দুর্দশার জন্য সমাজ দেহের নানা বিকারই দায়ী, তবে গ্রাম্য সমাজের অশিক্ষার দায়িত্বও অবশ্য স্বীকার্য। এ অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণের দায়িত্ব শিক্ষকের সমধিক ও এ দায়িত্ব তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

আমাদের দেশব্যাপী অশিক্ষা দূর করিয়া গ্রামবাসীগণকে যোগ্য নাগরিক করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে সামাজিক শিক্ষার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। সে পরিকল্পনাকে সফল করিয়া তোলার জন্য শিক্ষককে শ্রম দান করিতেই হইবে।

সামাজিক শিক্ষা ঃ

আমাদের বাংলাদেশে তথা সারা ভারতের সমাজ ও সভ্যতা গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই, আমাদের দেশের উন্নতি মানেই এর অসংখ্য গ্রাম ও গ্রামবাসীর উন্নতি। স্বরাট্র ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ গ্রামোন্নয়নের নানা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করেছেন।

আমাদের গ্রাম সমূহের সমস্যা অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ইত্যাদি বহু, আর সর্বোপরি এ সমস্ত দূরীকরণের জন্য অত্যাবশ্যক সংহতি বা সংঘশক্তির অভাব এবং সংহতির অভাবের মূলে আছে অশিক্ষা ও তজ্জনিত নানা সংকীর্ণতা ও ভেদবুদ্ধি।—তাই আজ দেশের উন্নতির জন্য প্রথম কার্যসূচী হবে দেশে সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের।

সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রথম আয়োজন স্কুল-কলেজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার, শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কার, যার ফলে আজকার বিদ্যালয়গামী কিশোর ও যুবক ছাত্রসমাজ নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের আনুসংগিকভাবে প্রয়োজনীয় সামাজিক শিক্ষালাভ করে নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হয়ে বেড়ে উঠবে।

কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্য, দেশে ছাত্র সমাজ ছাড়া এক অতি বিশাল জনসংখ্যা অজ্ঞতায় ডুবে আছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে তাদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য—যা উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে পালন

করা অসম্ভব, এবং বিরাট অজ্ঞতা ব্যাহত ও বিলম্বিত করছে সমগ্র জাতির অগ্রগতি,—প্রতি জনকল্যাণ প্রচেষ্টায় অপচয় হচ্ছে সময়, শক্তি ও অর্থের। মূঢ় জনগণকে নিয়ে গণতন্ত্র প্রকৃত হতে পারে না। আর প্রত্যেক সামাজিক সংস্কারের গোড়ায় প্রয়োজন জনসাধারণের মনে জ্ঞানের উন্মেষ—Renaissance must precede Reformation.

পরাধীনতার যুগে সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য এক বিদেশী সরকারকে দায়ী করে অব্যাহতি পাবার সুযোগ ছিল। কিন্তু আজ তো সব দায়িত্ব নিজেদের ঘাড়ে চেপেছে। তাই, আজ প্রত্যেক সংস্কারকামী শিক্ষিত ব্যক্তিকে সামাজিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব নিতে হবে—এ শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজ নিজ কার্য পরিধির মধ্যে সক্রিয় চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সরকার সব ব্যবস্থা করবে—এ ধারণায় বসে থাকলে কাজ হবে না। আর, আজকার সরকার ও জনসাধারণ তো অভিন্ন। তাছাড়া, কোন দেশে জনশিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার নেয়নি বা নিতে পারে না। সরকারের হাতে (মনে রাখতে হবে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র—"representative democracy"—রাষ্ট্র পরিচালনার ভায় ন্যস্ত থাকে সংখ্যা-গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল বিশেষের উপর। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য ও রূপ হবে সার্বজনীন, ব্যবস্থা হবে যে-কোন রাজনৈতিক দলের প্রাধান্য থেকে স্থায়িত্বে বহু দীর্ঘতর।) জনসাধারণের শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া মানে জনসাধারণের

গণতান্ত্রিক এক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার পরিহার করা। মহাত্মা গান্ধীজির মতে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ হতে হলে শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয় এ চার ব্যাপারে জনসাধারণের স্বাবলম্বন অপরিহার্য।

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই জনশিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত বাণী স্মরণীয় ঃ

"So long as the millions live in hunger and *ignorance*, I hold every man a traitor, who having been educated at their expense pay not the least heed to them."

সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য—"to develop a broad human interest, a proper understanding of one's social and physical environment, and the social virtues of an individnal to make an individual a worthy citizen of a modern democratic state."

উল্লিখিত উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে, ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষণীয় বিষয়-সূচী নিম্নোক্তরূপ হতে পারে ঃ

(ক) কোন হস্ত-শিল্প ;

(খ) ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক সাহায্য দান (first aid) ;

(গ) সাধারণ পৌর-বিজ্ঞান (civics) ;

(ঘ) সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান—প্রধানতঃ ও মূলতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের উপজীবিকা অনুসারে ;

(ঙ) দেশের ইতিহাস ও ভূগোল ;
(চ) সাধারণ জীবনযাত্রায় অত্যাবশ্যক অঙ্কের জ্ঞান ;
(ছ) সর্বজনীন ধর্ম ও সদাচারের মূলনীতি ;
(জ) দলগত খেলাধূলা ;
(ঝ) নিরক্ষরদের লেখাপড়া।

এ যাবৎকাল জন-শিক্ষা বলতে আমরা নিরক্ষর জনসাধারণকে অক্ষর-জ্ঞানদান বুঝতাম এবং আমাদের জনশিক্ষা প্রচেষ্টা বলতে মোটামুটি ওই বোঝাত। কিন্তু আক্ষরিক জ্ঞান লাভ নিরক্ষরের সামাজিক শিক্ষার প্রথম সোপান হলেও এর জন্য সমস্ত সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করলে ভুল হবে। আক্ষরিক জ্ঞান সামাজিক শিক্ষালাভের আরম্ভ ও উপায় বলেই গণ্য করা হবে—চরম বলে নয়। সামাজিক শিক্ষা প্রচেষ্টা—শুধু নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে নয়—প্রধানতঃ দেশব্যাপী অজ্ঞতার বিরুদ্ধে অভিযান।

নিরক্ষর জনসাধারণকে অক্ষর জ্ঞানদানের সংগে সংগেই ছবি, বক্তৃতা, "ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ", চলচ্চিত্র, "রেডিও", "গ্রামোফোন" ইত্যাদির সাহায্যে ও তাদের সংগে অবাধ আলোচনায় সামাজিক শিক্ষাদান সুরু কর্তে হবে।

জ্ঞানদানের সংগে সংগে নানা জনহিতকর কর্মানুষ্ঠান প্রথম থেকেই সুরু করতে হবে। এ জাতীয় কার্যের মধ্যে গ্রাম পরিষ্কার করা, পুকুর ইত্যাদি পরিষ্কার করা, পুকুর বা কূপ খনন, চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, খাল কাটা

ইত্যাদি ধরা যেতে পারে। গ্রামের উন্নতি এবং জনসাধারণের মধ্যে সংঘবোধ ও সংঘশক্তি উদ্বুদ্ধ করা ছাড়াও এ সমস্ত কর্মকে কেন্দ্র ও বাহন করে পূর্ব-বর্ণিত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের অনেক কিছু বিষয়ে জ্ঞানদানও করা যেতে পারে এবং কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা অধিক কার্যকরী হতে বাধ্য।

বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে কতকগুলি উৎসব অনুষ্ঠানের বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সামাজিক শিক্ষার কার্যক্রম পালনের জন্য এবং জনসাধারণকে এ কার্যক্রমে বিশ্বাসী ও সহযোগী করে তোলার জন্য জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি বিতরণের কেন্দ্রস্থলে থাকবে আনন্দ-পরিবেশন। এ ব্যবস্থা যাত্রাগান, কবিগান, বাউল বা ভাটিয়ালী গান, কথকতা, "রেডিও", "গ্রামোফোন" ইত্যাদি মারফৎ হতে পারে। কার্যতঃ, এ সকলের জন্য শিক্ষক বা শিক্ষকগণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বই সমধিক—অর্থব্যয় অত্যন্ত নয়।

সামাজিক শিক্ষার কাজ কতিপয় যোগ্য, উৎসাহী ও উদার ব্যক্তি যে-কোন একটা নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে সুরু করতে পারেন। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই এ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। নির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্রের মধ্যস্থলে (এমন কোন স্থানে যেখানে বারোমাস সহজ চলাচল ব্যবস্থা আছে) সামাজিক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৩১শে মে ১৯৪৮—তারিখে

এক সাংবাদিক সম্মেলনে সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গ্রাম্য বিদ্যালয় গৃহকে গ্রামবাসীর শিক্ষা, মিলন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য, আমাদের প্রদেশে গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় যদিও সেগুলোকে আদর্শ স্থান বলে গ্রহণ করা চলে না তবুও অগত্যা সেগুলোকেই সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্র করে কাজ সুরু করা যেতে পারে।

কেন্দ্রের অবস্থান অপেক্ষা কেন্দ্রের আভ্যন্তরিক পরিবেশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ ইংলণ্ডে জনশিক্ষার জন্য পরিকল্পিত "Community Centre"-নামক প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আদর্শ পরিবেশের ধারণা সৃষ্টির সহায়তা করবে।

"Conmunity Centres exist so that neighbours can come together on an equal footing to enjoy social, recreative and educational activities either as members of groups following particular hobbies and pursuits, or on the basis of their common needs and interests as human beings living in the same locality."

পরিচালকের সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেন্দ্রে নিয়মের বাধা-নিষেধ যেন যথাসম্ভব কম হয় এবং কেন্দ্রে সুযোগ-

ইত্যাদি ধরা যেতে পারে। গ্রামের উন্নতি এবং জনসাধারণের মধ্যে সংঘবোধ ও সংঘশক্তি উদ্বুদ্ধ করা ছাড়াও এ সমস্ত কর্মকে কেন্দ্র ও বাহন করে পূর্ব-বর্ণিত শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের অনেক কিছু বিষয়ে জ্ঞানদানও করা যেতে পারে এবং কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা অধিক কার্যকরী হতে বাধ্য।

বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ে কতকগুলি উৎসব অনুষ্ঠানের বা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সামাজিক শিক্ষার কার্যক্রম পালনের জন্য এবং জনসাধারণকে এ কার্যক্রমে বিশ্বাসী ও সহযোগী করে তোলার জন্য জ্ঞান, বিদ্যা ইত্যাদি বিতরণের কেন্দ্রস্থলে থাকবে আনন্দ-পরিবেশন। এ ব্যবস্থা যাত্রাগান, কবিগান, বাউল বা ভাটিয়ালী গান, কথকতা, "রেডিও", "গ্রামোফোন" ইত্যাদি মারফৎ হতে পারে। কার্যতঃ, এ সকলের জন্য শিক্ষক বা শিক্ষকগণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বই সমধিক—অর্থব্যয় অত্যন্ত নয়।

সামাজিক শিক্ষার কাজ কতিপয় যোগ্য, উৎসাহী ও উদার ব্যক্তি যে-কোন একটা নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে সুরু করতে পারেন। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই এ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। নির্দিষ্ট কার্যক্ষেত্রের মধ্যস্থলে (এমন কোন স্থানে যেখানে বারোমাস সহজ চলাচল ব্যবস্থা আছে) সামাজিক শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ৩১শে মে ১৯৪৮—তারিখে

এক সাংবাদিক সম্মেলনে সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে গ্রাম্য বিদ্যালয় গৃহকে গ্রামবাসীর শিক্ষা, মিলন ও আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য, আমাদের প্রদেশে গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলোর বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় যদিও সেগুলোকে আদর্শ স্থান বলে গ্রহণ করা চলে না তবুও অগত্যা সেগুলোকেই সামাজিক শিক্ষার কেন্দ্র করে কাজ সুরু করা যেতে পারে।

কেন্দ্রের অবস্থান অপেক্ষা কেন্দ্রের আভ্যন্তরিক পরিবেশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ ইংলণ্ডে জনশিক্ষার জন্য পরিকল্পিত "Community Centre"-নামক প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর থেকে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশ আদর্শ পরিবেশের ধারণা সৃষ্টির সহায়তা করবে।

"Conmunity Centres exist so that neighbours can come together on an equal footing to enjoy social, recreative and educational activities either as members of groups following particular hobbies and pursuits, or on the basis of their common needs and interests as human beings living in the same locality."

পরিচালকের সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেন্দ্রে নিয়মের বাধা-নিষেধ যেন যথাসম্ভব কম হয় এবং কেন্দ্রে সুযোগ-

সুবিধা-ভোগে বা আচরণে কোন প্রকার অসাম্য যেন না থাকে এবং সমবেত জনসাধারণ যেন বোধ করে যে এস্থানে সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক দলগত কোন ভেদ বা বিদ্বেষ নেই ; এ সম্বন্ধেও "Community Centre" সম্পর্কিত নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য স্মরণীয় : "Nearly all other social agencies tend to draw people together on a corporative basis. In the Community Centre they should meet as individuals and not as members of a Church, a Trade-Union or a political party. The centre must, therefore, be freely open to all who desire to join it, without any restriction on religious or other grounds."

কেন্দ্রাধ্যক্ষ যিনি হবেন তাঁর, যথেষ্ট সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত, সামাজিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তা ছাড়া যদি ব্যক্তিগতভাবে তিনি সংগঠন-কর্মে ও গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ হন এবং নিরলস ও আদর্শবাদী হন, তবে কেন্দ্রের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। শুধু চাকুরী হিসাবে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে সুফল নাও হতে পারে।

চলাফেরার অসুবিধা (বিশেষতঃ বর্ষাকালে) এরূপ কেন্দ্রের সাফল্যের পথে বিঘ্ন বলে বিবেচিত হতে পারে। এ বিঘ্ন শুধু, আমাদের বর্ষাবহুল দেশেই নয়, বিলাতেও

"Community Centre" খোলার পূর্বাহ্নে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেছে এ বাধা দূর হয়েছে বা অনতিক্রম্য হয়ে দাঁড়ায়নি।—গ্রামে আবশ্যক পথ-ঘাট নির্মাণ বা সংস্কার তো কেন্দ্রের করণীয় কার্যের মধ্যে গণ্য। তাই কিছুদিনের চেষ্টায় এ অসুবিধা দূর হবে বলে আশা করা যায়। কেন্দ্রের স্থান নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনে এ অসুবিধার আশঙ্কা কমতে পারে।

সংগতভাবে আশা করা যায়, যদি সরকারী বা বে-সরকারী প্রচেষ্টায় এ রকম কোন প্রতিষ্ঠানের মারফত সামাজিক শিক্ষা বিস্তারলাভ করে এবং গ্রামবাসীদিগকে সংহত ও সংঘবদ্ধ করে তোলা যায়, তবে ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম্যসমাজ পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, "শান্তির-নীড়" গ্রামগুলি আবার আনন্দমুখর হয়ে উঠতে পারে। *

সমাপ্ত

* "শিক্ষাব্রতী"-তে (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) লেখকের প্রবন্ধ।